আমার মা'র বাপের বাড়ি

রানী চন্দ

আমার মা'র বাপের বাড়ি

রানী চন্দ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলকাতা

প্রকাশ ১ বৈশাখ, ১৩৮৪
পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯৩
মাঘ ১৪১৩

প্রচ্ছদ শ্রীখালেদ চৌধুরী

© বিশ্বভারতী

ISBN-81-7522-404-5

প্রকাশক কুমকুম ভট্টাচার্য
বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক জে. জে. প্রিন্টার্স
৪৭ আবুল কালাম আজাদ সরণী। কলকাতা ৫৪

আমার মা'র বাপের বাড়ি

আমার দিদি— শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ঘোষকে

মনে পড়ে— কথায় কথায় যখন মহা উৎসাহে গ্রামের এ-গল্প সে-গল্প করতাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাছে, একদিন তিনি বললেন আমার ছোটোবেলার গ্রামের স্মৃতিগুলি লিখে ফেলতে। বললেন, 'গ্রামে ভালোর দিকটা যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর— সেইটুকুই শুধু ছবির মতো ফুটিয়ে তুলবি। গ্রামের জীবন তো আর পাবি না ফিরে। লেখ্— লিখে ফেল্।'

লেখা হয় নি।

এ আজ চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগেকার কথা।

কিছুকাল আগে মা চলে গেলেন। বুকের ভিতরে একটা কান্না গুম্‌রে ফিরতে লাগল। এ সময়ে মাকে ঘিরে মা'র বাপের বাড়ির স্মৃতি মনে জাগত, মাঝে মাঝে বসে টুকরো টুকরো ভাবে লিখে রাখতাম। লিখতে ভালো লাগত। এও আজ আট-নয় বছর আগের কথা।

এবারে গ্রীষ্মাবকাশে পুত্র-পুত্রবধূ অভিজিৎ-শিপ্রার কাছে নিশ্চিন্ত অবসরে লেখাগুলি বের করে ফিরে লিখলাম।

লিখলাম— আর মনে পড়তে লাগল— এই কথাটাই বুঝি সেদিন বোঝাতে চেয়েছিলেন গুরুদেব আমাকে।

আমি বুঝি নি—ভেবেছি— এ নিয়ে আবার লিখবার কী আছে?

মা লিখিয়ে নিলেন।

৬ আষাঢ় ১৩৭৯ রানী

আমার মা'র বাপের বাড়ি গঙ্গাধরপুরে। বিক্রমপুরের ছোট্ট একটি গ্রাম— ছায়ায় ঢাকা, জলে সবুজে ভরা। আগে এর নাম ছিল 'গঙ্গাধর-খোলা'। আশেপাশে সব নামডাকের গ্রাম। তার মাঝখানে গঙ্গাধর-খোলা যেন মাথা তুলতে পারে না কোনো কিছু নিয়ে। মামারা বড়ো হয়ে সদরে লেখালেখি করে 'খোলা' বদলে 'পুর' করলেন। গঙ্গাধর-খোলা হল গঙ্গাধরপুর। যেন সে নামে এখন খানিকটা সভ্য হয়ে জাতে উঠল।

ঢাকা শহরের একপ্রান্তে গেণ্ডারিয়া। বাবা মারা যেতে মা তাঁর নাবালক পুত্রকন্যাদের নিয়ে গেণ্ডারিয়াতে বাসা-বাড়ি নিলেন। অনেকখানি জমি নিয়ে বাড়ি; সামনে পিছনে নানারকম ফলফুলের গাছ, মাঝখানে থাকবার দালান— ছোট্ট একটি উঠোন, উঠোনের পাশে রান্নাঘর— নিরামিষ আমিষ আলাদা আলাদা।

'রাইমোহন কবিরাজের বাড়ি'— এই বলেই খ্যাত বাড়িটি। ঠিকানাও লিখতে হয় এই বলে চিঠির উপরে। ঠিক ঠিক এসে যায় সে চিঠি হাতে। আর খ্যাতি এ বাড়ির— সদর দরজার গা-লাগা বাইরের দিকে আছে প্রকাণ্ড এক ঝাপ্‌ড়া আমগাছ। এই আমগাছ দিয়েই এ বাড়ির নিশানা দেয় লোকে, বলে 'আমগাছওয়ালা বাড়ি'। পথজুড়ে এই আমগাছ— আমের দিনে এক শোভা! বড়ো বড়ো গোল গোল আম ধরে গাছ ভরে প্রতি বছরে। এই আম গাছেই ঝোলে, গাছেই পাকে। কি কাঁচা কি পাকা কোনো অবস্থাতেই একে ছোঁয় না কেউ— না মানুষ না পাখি। এমনিই টকগুণ এই আমের। লোকে এই আমগাছের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করে, যেন টক স্বাদটা এসে লাগছে জিবের ডগায়।

বড়দা আমাদের সকলের বড়ো, তিনি বিলেতে। বড়দার পরে কয়েকটি ভাইবোন বেশ বড়ো হয়েই মারা যান। তার পরে দুই দাদা, আমরা দু বোন আর আমাদের শিশু ভাই— এই নিয়ে মা'র সংসার।

দুই দাদা পড়েন ছেলেদের স্কুলে; দিদি আমি আমরা দু বোন যাই ঢাকা 'ইডেন হাই স্কুলে'। স্কুল থেকেই ঠিক করা ঘোড়ার গাড়ি আসে বাড়ি বাড়ি থেকে ছাত্রী তুলে নিতে। আমাদেরও নিয়ে যায়, দিয়ে যায় রোজ। দাদারা হেঁটেই যাওয়া-আসা করেন।

টুকিটাকি ছুটি ছাড়া স্কুলে লম্বা ছুটি হয় বছরে দু'বার। এক গরমের ছুটি, আর পুজোর ছুটি। এক ছুটির পরে আর-এক ছুটির দিনগুলি আঙুলে গুনতে

থাকি। এই দুই ছুটিতেই মামাবাড়ি আসি আমরা। আসবার দু-তিন দিন আগে থেকেই সে কী উত্তেজনা আমাদের!

মামাদের একজন আসেন আমাদের নিয়ে যেতে। বুড়িগঙ্গার ঘাটে সারি সারি নৌকো বাঁধা— এক মাল্লাই, দো মাল্লাই, তিন মাল্লাই, চার মাল্লাই—। যত মাল্লাই নৌকো তত জন মাঝি থাকে তাতে। আকারেও বড়ো হয় সেই অনুপাতে।

মামা আগের দিন সন্ধেবেলা এসে নৌকো পছন্দ করে দরদস্তুর ঠিক করে রেখে যান। পরদিন ভোর না হতে ঘোড়ার গাড়িতে করে সবাই বুড়িগঙ্গার ঘাটে এসে উপস্থিত হই। মালপত্র ওঠাবার আগেই আমরা ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিই নৌকোয় উঠতে। আমাদের উঠিয়ে মালপত্র বোঝাই হলে পর মা গলুইতে তিন বার জল দিয়ে তিন বার সেই হাত মাথায় ঠেকিয়ে দু পা জলে ডুবিয়ে ধুয়ে নৌকোয় উঠে আমাদের আগলে নিয়ে বসেন। নৌকো ছেড়ে দেয়।

মা জলের দেশের মেয়ে, তবু জলের দোলা সইতে পারেন না। নৌকোতে উঠলেই তাঁর মাথা ঘোরে, বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দিদিরও তাই। মা আর দিদি নৌকোর ভিতরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন। ছোটোভাইকে মা কোলের কাছেই শুইয়ে-বসিয়ে রাখেন। আমি দাদাদের সঙ্গে মামার সঙ্গে 'ছই'-এর বাইরে এসে বসে থাকি।

এক মাঝি পিছন দিকে হাল ধরে বসে থাকে, দুই মাঝি সামনের দিকে দু পাশে বসে বৈঠা বায়।

বসে বসে দেখি।

সকাল পেরিয়ে যায়। ধলেশ্বরী নদীতে নৌকো এসে পড়ে।

এই ধলেশ্বরী পাড়ি দেওয়াই এক বিষম আতঙ্কের ব্যাপার। মা চোখ বুজে শুয়ে থেকে থেকেই বলে ওঠেন— "ধলেশ্বরী আইলো নাকি ও— ও মাঝি ভাই?"

ধলেশ্বরী এসেছে শুনে মা দু চোখ টিপে বালিশের ভিতর মাথাটা আরো গুঁজে দেন; 'রাম' নাম নেন।

মাঝিরাও ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বড়ো মাঝি আকাশের দিকে তাকায়, হাওয়ার দিক লক্ষ করে, জলের গতির উপরে নজর রাখে, পরে তিন মাঝি স্বর মিলিয়ে 'বদর বদর হৈ' বলে নৌকোয় পাল তুলে দেয়।

ধলেশ্বরীর ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ে নৌকোর গায়ে। ঘোলা জল— বিরাট নদীর একূল ওকূল দুকূল ভরা জলে। ভেবে পাই না মাঝিরা নৌকো নিয়ে চলেছে কোন্ দিকে।

সবাই এক আতঙ্কে স্থির বসে। কথা নেই কারো মুখে। মাঝিরা শুধু থেকে থেকে হুংকার দিয়ে ওঠে— 'বল ভাই— বদর বদর হৈ'।

ধলেশ্বরী ক্ষেপা নদী। তালে বেতালে চলে। এলোপাতাড়ি ঢেউয়ের ধাক্কা কখনো এদিক হতে এসে লাগে, কখনো ওদিক হতে। চলার তাল ঠিক রাখতে জানে না ধলেশ্বরী। তাই হুঁশিয়ার থাকে মাল্লামাঝি যাত্রীভরা নৌকো নিয়ে।

ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে শান্তধারায় নৌকো আসে। মা উঠে বসেন। বলেন, "মাঝি ভাই রে— পাড়ে একটু লাগাও নৌকো, দুই পা একটু হাঁটি।"

নৌকো পাড়ে লাগে। টুপ্‌টাপ্‌ ভাইবোনেরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ি। পাড়ে নলখাগড়ার বন, বালির চর— ছুটোছুটি করি। গত রাত্রের রান্না করে আনা লুচি আলুর দম হালুয়া জলের ধারে বসে খাই। খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে আবার নৌকোয় উঠি।

এবার মাঝিরা নিশ্চিন্ত মনে জলে নৌকো ভাসায়। এক মাঝি নৌকোর পিছন দিকের পাটাতন তুলে নীচে রাখা মাটির উনুনে কাঠ জ্বালে। একটা মাটির মালসাতে করে নদীর জলে চাল ধোয়। পরে চালে জলে মাটির হাঁড়ি ভরে জ্বলন্ত উনুনে বসিয়ে দেয়। লাল লাল মোটা মোটা চাল দেখতে দেখতে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে আরম্ভ করে।

ভাত হয়ে গেলে মাটির কড়াইতে মাছের ঝোল রাঁধে। বেশির ভাগ সময়ে ইলিশ মাছই থাকে। পথে আসতে আসতে এক সময়ে কিনে নিয়েছে জেলেডিঙা থেকে। নুনমাখানো মাছে একটু হলুদবাটা আর কাঁচালঙ্কা ছেড়ে রান্নাকরা মাছের ঝোলের সুগন্ধ ভুর্‌ভুর্‌ করে। মাঝিরা একে একে মাটির থালায় ভাত বেড়ে খেয়ে নেয়। হাত বাড়িয়ে নদীর জলে থালা, বাটি, হাঁড়ি, কড়াই সব ধুয়ে আবার তুলে রাখে পাটাতনের নীচে।

ধীরে মন্থরে হেলে দুলে নৌকো চলে। মাথার উপরে গাঙচিল উড়ে উড়ে চলে। শুশুক ওঠে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর— নিশ্বাস নিতে। একমনে দেখতে থাকি।

সূর্যের তাপে মাঝিদের গায়ের ঘাম শুকিয়ে কালো পিঠে 'সাদা' ফুটে ওঠে। মা বলেন— 'নুন ফুটে উঠছে'। মাঝিরা নাকি নুন বেশি খায়— তাই এমনিভাবে নুন ফুটে ওঠে গায়ে।

মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, বেলার দিকে তাকিয়ে মাঝিদের তাড়া দেন— "মাঝি ভাই রে— অ' মাঝিভাই— বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছাইয়া দিবা। তাড়াতাড়ি বাও।"

ইছামতী— যেন লক্ষ্মী মেয়েটি। অতি শান্ত তার চলার গতি। ইছামতীতে এলে পর তীরের দিকে নৌকো সরিয়ে এনে কম জল দেখে দুজন মাঝি হাঁটু-জলে লাফিয়ে পড়ে। হাতে তাদের মোটা দড়ি, মোটা কাঠি। তীরে উঠে এবারে তারা 'গুণ' টানতে থাকে। নৌকোয় বাঁধা লম্বা দড়ির আর-এক মাথা মোটা কাঠির সঙ্গে বেঁধে কাঠিটা ঘাড়ে চেপে ধরে নদীর পাড় দিয়ে দিয়ে চলতে থাকে মাঝিরা। সে রশির টানে নৌকোও এগিয়ে চলে জলের উপরে তর্‌তর্‌ করে।

চলতে চলতে বাঁদিকের উঁচু পাড়ে বটগাছের ছড়ানো শিকড় ধুয়ে যে খাল এসে পড়েছে ইছামতীর বুকে— সেই খালের মুখে নৌকো ঢোকে। মাঝিরা এবারে 'গুণ' 'বৈঠা' তুলে রেখে 'লগি' তুলে নেয় হাতে। খালের জলে লগি ঠেলে ঠেলে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলে।

খালের ধারে বাবন খাঁ দাদার বাড়ি। দাদামশায়ের বন্ধু ছিলেন বাবন খাঁ। বড়ো ভাইয়ের মতো দেখতেন ইনি দাদামশায়কে। মা ডাকতেন 'বাবন চাচা' বলে।

বাবন দাদার বড়ো ছেলে আলি হোসেন খাঁ। খালের জলে নৌকো আসতে দেখে হোসেন মামা হুঁকো টানতে টানতে এগিয়ে আসেন, বলেন, "কার বাড়ির 'নাইওরি' লইয়্যা যাও রে মাঝি?"

মা ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে বলেন—"আমি গো— হোসেন ভাই।"

মাকে দেখে হোসেন মামা একমুখ হাসেন, বলেন— "পুণি বইনদি যাও? তাই কও।"

মার নাম 'পূর্ণশশী', তাই ছোটো করে 'পুণি' বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা।

হোসেন মামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন। বলেন— "পোলাপান লইয়্যা খাইও তুমি বাড়িতে গিয়া।"

খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখ মামাদের বাড়ি। খালে নৌকো ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে— কে আইলো?— না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো।

মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেবার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়। 'টানে'র দিনে বাড়ির ঘাট অবধি আসে না নৌকো। ডাঙা-পথে দিদিমারা এগিয়ে আসেন মুরলী ঘোষের বাঁশঝাড় অবধি। নৌকো যখন এসে থামে— ততক্ষণে দস্তুর মতো ভিড় সেখানে।

গরমের ছুটিতে গ্রামে ঢুকি আমরা এই পথে। পুজোর ছুটিতে ঢুকি জল-ভরা বিলের উপর দিয়ে।

সে সময়ে তখনো বর্ষার জল সরে যায় না সব। ঢালু জমিতে থৈ থৈ জল। নন্দীদের বাঁধানো ঘাট থেকে ধূ ধূ বিল দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। নৌকো এগিয়ে আসছে দেখতে পেয়েই হাঁকাহাঁকি পড়ে যায় ঘাটে— কার বাড়ির কুটুম আসছে— কার বাড়ির নাইওরি? পাড়ার লোক ছুটতে ছুটতে এসে জমে ঘাটে। গ্রামের মেয়ে বউ আসছে গ্রামে— এ আনন্দ যেন এদের সকলের। বধূরা বাদে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলে এসে ভিড় করে ঘাটে। দূর হতে দেখা যায় সেই ভিড়। মা ততক্ষণে ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন আর মাথা ঘোরার কথা মনে নেই তাঁর।

বর্ষার জর্মা জল— অসুবিধা নেই কোনো, একেবারে বাড়ির ঘাটে এসে লাগে নৌকো। সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর পর সকলের সমান উল্লাস— যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ। হৈ-চৈ উচ্ছ্বাস আনন্দে কেটে যায় বাকি বেলাটুকু।

সন্ধেবেলার শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে। যে যার বাড়ি ফিরে যায়। আমরাও হাত মুখ ধুয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে ঘরে ঢুকি।

২

মা'র বাপের বাড়ি— যেন মা'র সিংহাসনখানি। আট ভায়ের একমাত্র বোন। বড়োমামার পরে মা— মা'র পরে আর সাত ভাই। মা ছিলেন দাদামশায়ের চোখের মণি। সেই মণিটি দাদামশায় যেন গঙ্গাধরপুরের মাটিকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন। গাঁয়ের গর্ব ছিলেন মা।

মা বাপের বাড়ি এসেছেন, বাড়িতে উৎসব লেগে যায়। মামারা গোয়ালা-বাড়ি থেকে পিতলের কলসিতে করে দুধ আনেন— পিঠে-পায়েস হবে। পুকুর বিল থেকে মাছ ধরেন— ভাগ্নে-ভাগ্নীরা খাবে। বেতবন থেকে 'বেথাইক'— বেতের নরম কচি ডগাটুকু কেটে আনেন; তার ভিতরের সাদা নরম শাঁসটুকু মা ভাতে সিদ্ধ খেতে ভালোবাসেন। ঢেঁকিশাক, গিমাশাক, পানিকচু, কচুর লতি— মা'র যত প্রিয় খাবার ছুটে ছুটে যোগাড় করেন। সুপারীগাছে উঠে সুপারী পাড়েন। নারকেলগাছের নারকেল ঝাড়েন— এতদিন মা'র নামে ছিল ঝুনো নারকেলগুলি গাছে। মামীরা একগলা ঘোমটা টেনে মস্ত উঠোন চঞ্চলপদে পারাপার করেন; মুহুর্মুহু এক ভিটার ঘর হ'তে আর-এক ভিটার ঘরে আসেন, যান।

ভোরবেলা মা হাত মুখ ধুয়ে বাসি-বাস ছেড়ে শোবার ঘরের উঁচু দাওয়ায় বসেন। মামীরা তাঁর সামনে জলের গামলা, বারকোষ, বঁটি, থালা, তরকারির ডালা সব পর পর সাজিয়ে দেন। মা বসে বসে তরকারি কোটেন।

তরকারি কোটায় মা'র বরাবরের শখ। মা তরকারি কেটে গামলার জলে ধুয়ে ভাগে-ভাগে এমনভাবে থালায় বারকোষে সাজিয়ে রাখেন, দেখে মনে হয় যেন দেবতার সামনে নৈবেদ্য সাজানো হয়েছে।

কোনো তরকারি রাখেন কাঁসার থালায়, কোনো তরকারি বারকোষে, কোনো তরকারি বেতের ডালায় বা বাঁশের সাজিতে। বলেন, নইলে কোটা তরকারির স্বাদে তারতম্য ঘটে পাত্রের বৈষম্যে। ঝোলের আলু, ঝালের আলু— আলুর টুকরোয় তার গড়ন হয় আলাদা। আমাদের নজরে পড়ে না তা; কিন্তু মা ঠিক ধরতে পারেন। অসাবধানে একটা দুটো মিলে মিশে গেলে অসন্তুষ্ট হন।

মা'র তরকারি কোটার নিপুণতা শেখবার জিনিস— দেখবার জিনিস। বারকোষ ভরে লাউ কেটে দিয়েছেন মা— থরে থরে এমনভাবে কোটা লাউয়ের গোছা রেখেছেন— যেন যুঁই ফুলের এক স্তূপ। চোখে ভাসে ছবি— ঘোমটায় ঢাকা মামীমা কাঁধ বরাবর উঁচু করে বাঁ হাতের তেলোয় লাউভরা বারকোষ নিয়ে চলেছেন উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে যেন পূজারিণী চলেছে মন্দিরের ফুল নিয়ে।

মা কুট্‌নো কোটেন— গাঁয়ের লোক পাড়ার লোক কত এসে জমে সেখানে। দাওয়া ভরে যায়। মা কুট্‌নো কোটেন আর তাদের কথা শোনেন। ছ'মাসে কত কথা জমে থাকে— কত সুখ-দুঃখের কাহিনী— কত হাসি-অশ্রু— আনন্দ-বিষাদ— বিগত-আগত কত ঘটনা!

মা'র এই দক্ষিণের ভিটার উঁচু দাওয়ার আসর জমাট থাকে সন্ধ্যা সকাল সব সময়ই।

গ্রামে যেমন সব বাড়িতেই মাঝখানে উঠোন রেখে চার দিকে ঘর তোলে গৃহস্থেরা— এ বাড়িতেও তাই। পুব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ— উঠোনের চার ধারে চার ভিটায় ঘর। পুব-দক্ষিণের রোদ হাওয়া উত্তম। এই দুই ভিটায় বড়ো বড়ো চৌচালা ঘর। এগুলি শোবার ঘর। পশ্চিম ভিটায় রান্নাঘর। আর, উত্তর ভিটার ঘর— উত্তর দিকটা হল সবচেয়ে নিকৃষ্ট দিক থাকবার পক্ষে। তার উপরে উত্তর দিকটা গাছে ছায়ায় ঝোপে ঝাড়ে ভরা। দিনের বেলাও ওদিকটায় তাকালে মনে হয় যেন একটা ঠাণ্ডা অন্ধকার পিট্‌পিট্ তাকিয়ে এগিয়ে আসছে কাছে। এ ছাড়াও উত্তর ভিটার ঘরে থাকতে চায় না বড়ো কেউ। কবে কে জানি মরেছিল— তাই

নিয়ে কে জানি ওদিকটায় কি ভয় পেয়েছিল —চল্‌তি কথা চলতে চলতে, এখনো এসে ঠেকে আছে ওখানে। দুপুরবেলা সেই ভিটেয় গেলে গা ছম্‌ছম্‌ করে আমাদের। এই উত্তরের ভিটার ঘরখানিতে এখন দিনে বড়োমামীমার পাঠশালা বসে। আর আসে জন, বসে জন— কি কুটুমজন কেউ এলে তো রাত্রে থাকতে দেওয়া হয় তাকে সে ঘরে।

জলের দেশ; তাই কোমর-সমান বুক-সমান উঁচু সব ঘরের ভিত— মাটির। ঘরের চার দিকে মোটা মোটা শালগাছের থাম। থামের সঙ্গে ছেঁচা মুলি বাঁশের বুননি গাঁথা শক্ত মজবুত বেড়া বেত দিয়ে বাঁধা। এই বেতের বাঁধুনিও এক নকশা। বেড়ার মাঝে মাঝে জালি-কাটা জানালা, বাইরের দিকে ঝাঁপ তোলা। ঘরের উপরে টিনের চাল। চালের নীচে লম্বা লম্বা কাঠের তক্তা পাতা 'কার'। কারের একটা কোনা চৌকো চৌবাচ্চার মাপে খোলা। সেখানে মইয়ের আকারে কাঠের সিঁড়ি পাতা। এই মই বেয়ে ঘরের বউ-ঝিরা দিনে শতবার কারে ওঠে নামে, জিনিসপত্র রাখে— বের করে।

কারে থাকে সংসারের যাবতীয় কিছু তোলা। বড়ো বড়ো মাটির মটকায় সম্বৎসরের চাল, ডাল, গুড়, ধান; ক্রিয়াকর্মের ভারী ভারী বাসন, বউ-ঝিদের পোশাকী শাড়ি গহনা-সমেত ট্রাঙ্ক —সব উঠে যায় 'কার'-এ। মেঝে থাকে হালকা ঝরঝরে।

বেড়ার গায়ে ঝোলানো আলনায় থাকে নিত্যকার জামাকাপড়। টানানো 'তাক'-এ থাকে প্রসাধন-সামগ্রী— আয়না চিরুনি সিঁদুর তেল, টুকিটাকি জিনিস। নক্‌শাকাটা 'শিকা'য় 'শিকা'য় ঝোলে শিশি বোতল কাসুন্দির হাঁড়ি। আর 'জোত'-এ তোলা থাকে বিছানা বালিশ চাদর তোশক লেপ মশারি। সব-কিছু ঝোলে ঐ ঘরের বাঁশের বেড়ার গায়ে গায়ে। মেঝেতে থাকে শুধু শোবার খাট, খাটের উপরে বিছানো থাকে মাদুর সতরঞ্চি দিনের বেলায়।

ঘরে ঘরে কাঠের দরজা। প্রধান ঘরের দরজার পাল্লায় পদ্মলতার নকশা খোদাই। চৌকাঠের মাথায় মুখোমুখি দুই টিয়ে পাখি— ঠোঁটে লতা ধরা। দাওয়ার উপরে পর পর কাঠের হাঙর— ভার ধরে আছে ঘরের চালের।

সাদামাটির পৈঠার উপরে কোমর অবধি গাবের কষে রাঙানো বাঁশের বেড়ার ঘরগুলি সুপারি নারকেল গাছের ফাঁকে ফাঁকে ছবি হয়ে ফুটে থাকে— কি রাত্রি, কি দিনে, আলোছায়ার সামনে।

দক্ষিণের ভিটার ঘরখানিই বাড়ির প্রধান ঘর। ঘরের ভিতরে দরজা বরাবর ওদিককার বেড়ার ঠিক মধ্যিখানে যে থামখানা, সেটি হল 'মধুখাম'। এই মধুখামখানা হয় সব চেয়ে ভালো, নিটোল নিখুঁত। বুক-সমান উঁচুতে মধুখামের গায়ে হাতখানেক

জায়গা নিয়ে হাতে আঁকা 'লক্ষ্মী'র ছবি। ছবির নীচে ছোট্ট একটি কাঠের 'তাক'। নিত্য ভোরে স্নানের পরে মামীরা 'লক্ষ্মী'র নামে এখানে ফুল-জল দেন, লক্ষ্মীর চরণে সিঁদুর ছোঁয়ান, প্রণাম করেন, নিজের কপালে সিঁথিতে সিঁদুর পরেন। পরে গৃহকর্মে রত হন।

সন্ধেবেলা আবার দোরে জলের 'ছিটা' দিয়ে মধুখামের গোড়ায় ধূপদীপ জ্বালান, শাঁখ বাজান।

বৃহস্পতিবার— লক্ষ্মীর বার। এদিন মামীরা বিশেষভাবে পুজো দেন লক্ষ্মীর। সকালবেলা মধুখামের গোড়ায় আম্রপল্লব দিয়ে ঘট বসান, পল্লবে ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দেন। সন্ধেবেলা ধূপদীপ জ্বালিয়ে পুজো করেন, পিতলের রেকাবি ভরে বাতাসা নারকেল ভোগ দেন, লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়েন। এই লক্ষ্মীর পাঁচালীই এদিনের পূজার প্রধান অঙ্গ। গৃহস্থের এক অলক্ষ্মী বউয়ের জন্য সংসার ছারখারে গিয়েও মা লক্ষ্মীর কৃপায় কি করে আবার সব ফিরে এল এবং গৃহলক্ষ্মীদের কী কী কর্তব্য সংসারে— এই-সব কাহিনী দিয়ে পাঁচালীর বই— ছড়ায় লেখা। এক মামী সুর করে পড়েন, আর সবাই ঘিরে বসে শোনে।

লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়ার পর পুজো সাঙ্গ হয়। বার বার তিন বার শঙ্খধ্বনি পড়ে। তিন হল শুভ সংখ্যা। এই শঙ্খধ্বনি সেদিন ভেসে আসে সন্ধেবেলা ঘর ঘর থেকে— কিছু আগে পরে, এপাড়া ওপাড়া— দূরে নিকটে।

৩

দক্ষিণভিটার দক্ষিণে তুলসীমণ্ডপ। বাইরের দিক। এই দিকেই সদর পথ। পথ বলতে সবই পায়ে-চলা পথ। চল্‌তিপথে জলকাদা জমলে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেঁকে পায়ে পায়ে আবার অন্য পথ কেটে নিলেই হল। সেটুকুরও সব সময়ে প্রয়োজন হয় না, গৃহস্থদের উঠোন পেরিয়েই পথ পার হয়ে যায় লোকে।

এই তুলসীমণ্ডপ থেকে দক্ষিণে এগিয়ে আর-একটু নামলেই ঢালু জায়গাটায় লোক-চলাচলের সরু একটি রাস্তা। বর্ষার জলে খাল হয়ে যায়। বছরের কয়েক মাস মাত্র লোকে চলতে পারে এ পথে। পথের ওপারে উঁচু একফালি ডাঙা; এ ডাঙায় মা'র যুগিন খুড়ার বাড়ি।

গঙ্গাধরপুর মা'র বাপের দেশ। গঙ্গাধরপুরের আশেপাশের খানকয়েক গ্রাম জুড়ে শূদ্র নমঃশূদ্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ— সবাই মা'র সম্পর্কের জন। ভাই, বইন, খুড়া

খুড়ি, জ্যাঠা জেঠি— আর বিধবা হয়ে পিত্রালয়ে এসে আজীবন বাস করছেন যে-সব বৃদ্ধার দল— তাঁরা সবাই মা'র পিসি।

তেমনি জ্ঞাতি নয়, কুটুম্ব নয়— যুগিন খুড়া— মা'র খুড়া। সোজা শক্ত লম্বা মানুষ, আঁটসাট মাংসপেশীগুলি যেন সর্বাঙ্গে আট্‌কে বসানো। মুখখানা লম্বা, ধারালো। নীচের ঠোঁটটা পুরু, কথা বলবার সময়ে ঝুলে থাকে। চোখ দুটি বড়ো বড়ো গোল গোল। এই চোখ লাল হয়ে থাকে সদাসর্বদা।

যুগিন খুড়ার তিন মেয়ে এক ছেলে। ছেলেটি সর্বকনিষ্ঠ; মেয়েরা বড়ো হয়ে যাবার অনেক পরে জন্ম হয় ছেলের। নাম রাখলেন তার পরানগোপাল, মানে প্রাণগোপাল। আদরের ছেলে; যুগিন খুড়া কাজে অকাজে থেকে থেকেই হাঁক পাড়েন— 'ওরে পরাইনা রে'। সে হাঁক এ পাড়ার সবাই শুনতে পায়। গলার জোর ছিল তাঁর। খুড়া-খুড়ির উদ্দেশে মা হেসে বলেন, "বেশি বয়সের ছেলে কিনা তাই এত আহ্লাদ পরাইনার।"

যুগিন খুড়া নিজে যেমন শক্ত লম্বা দীর্ঘ অবয়বের পুরুষ, তাঁর স্ত্রীটি ছিলেন তেমনি ছোট্টখাট্টো হালকা মানুষটি। মুখে কথা ছিল না বেশি, ছিল হাসি-হাসি ভাব। নাম বিনোদিনী। মা বলেন, বিনি খুড়ি। ক্ষেতখামার গাই-গোরু নিয়ে বড়ো গৃহস্থ যুগিন খুড়া, তাই সারাদিন কাজের অন্ত নেই বিনি খুড়ির। মেয়েরা বিয়ে হয়ে যে যার শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। ক্ষেতের ধান, ডাল, সর্ষে, তিল নিজের হাতে খুড়ি বাছেন ঝাড়েন, ঘরে তুলে রাখেন। ধান সিদ্ধ করে উঠোনময় রোদে দিয়ে শুকোন। ঢেঁকিতে ধান কোটেন। চিঁড়ে মুড়ি ভাজেন। সব-কিছু করেন তিনি একার হাতে।

এ-সবের উপরে আছে যুগিন খুড়ার পাটের ক্ষেত। কাম্‌লা মজুর পাওয়া যায় না তেমন এ সময়ে। চাষী ভুঁইমালী সকলেই ব্যস্ত যে যার আপন আপন ক্ষেত নিয়ে। যুগিন খুড়া সেজন্য অপেক্ষাও করেন না কোনো। পাটগাছ কেটে জলের তলায় পাটগাছগুলি ভিজিয়ে রাখেন, 'জাক্' দেন। পচে গেলে যখন তোলার সময় হয়, যুগিন খুড়া নিজেই সেই পচা জলে নেমে পচা পাটগাছের গোছাগুলি তুলে নৌকো বোঝাই করে পাড়ায় পাড়ায় নামিয়ে দেন। নমঃশূদ্র মেয়েরা পচা পাটগাছ থেকে পাঠ ছাড়িয়ে আলাদা আলাদা পাটের আঁটি বেঁধে রাখে, পাটকাঠিগুলি নিজেরা নেয়। নিয়ম তাই। বর্ষাকালে ভিজে উনুন ঘরে ঘরে, তখন এই 'পাটশল্‌মী' ছাড়া উনুন জ্বলে না আর কিছুতে।

সারাদিন ধরে চলে এই পাট তোলা মেয়েদের। এক-একটা গোছা কাছে টেনে নিয়ে বসে, আর পলকে ছাল ছাড়াবার মতো এক-একটার গা হতে পাট ছাড়িয়ে

নেয়। শ্যাওলাধরা পচা পাট হতে মুক্ত হয়ে সাদা ধব্‌ধবে লম্বা লম্বা পাটশল্‌মীগুলি সাদা হাড়ের স্তূপের মতো সামনে জড়ো হতে থাকে এক-একজনের। যে যত তাড়াতাড়ি পারে এ কাজ, তার তত বেশি পাটশল্‌মী লাভ।

খুড়া এসে সেই ছাড়ানো পাটের আঁটি নিয়ে নিজের ঘাটে জড়ো করেন। সে সময়ে খুড়ার প্রায় সর্বাঙ্গ থাকে খোলা, কেবল সবুজ একটা লুঙ্গি উরুর উপরে টেনে আঁটসাট করে মালকোঁচা দিয়ে পরা।

তার পর স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি কোমর-জলে দাঁড়িয়ে আছড়ায় সেই পাট। কেউ কোনোদিন বিনি খুড়িকে কাজ নিয়ে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখে নি।

বর্ষাকালে পাটের ব্যবসায়ীরা নৌকো করে আসে, যুগিন খুড়ার পাট কিনে নেয়। এ বছর পাটে খুব লাভ হল। খুড়া সহজে কিছু খরচ করেন না, কিন্তু এবারে কেন জানি কী মনে হল, স্ত্রীকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিলেন। মাঝ-বয়সী বিনি খুড়ি হাত বাড়িয়ে মা'কে সোনার চুড়ি দেখান আর নববধূর মতো লাজে রাঙা মুখে আঁচল চাপা দেন। যুগিন খুড়া বেছে বেছে চুড়ির প্যাটার্ন বের করেছেন— নাম 'কপিপাতা প্যাটার্ন'। চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা চওড়া চওড়া চুড়ি— যার তিন গাছা চুড়িতেই ছোটোখাটো বিনি খুড়ির এক-এক হাত ভরাট হয়ে গেল।

যুগিন খুড়ার বাড়িই এ পাড়ার দক্ষিণদিকের শেষ বাড়ি। ওখান থেকে নেমে তলার খালশুক্‌নো পথে পুবদিকে দু'পা গেলেই হেরম্ব খুড়ার বাড়ি। একটুখানি একটা উঁচু ডাঙা, চার দিকটা ঢালু; টিলার মতো। বর্ষাকালে জলে ভরে যায় সব, তাই উঁচু ঢিবি দেখে বসতভিটে বেছে নেয় লোকে। ঘর তোলে তার উপরে। তবু কি জল মানে? এ ছাপিয়েও জল গিয়ে ওঠে উঠোনে। বর্ষাকালে এগুলি দেখায় যেন ছোটো ছোটো দ্বীপ এক-একটি। বিশেষ করে হেরম্ব খুড়ার বাড়িটা। অন্য বাড়িগুলির তবু জমির একদিকটা দিয়ে ডাঙার সঙ্গে ডাঙার সংযোগ আছে উঠোনে জল এসে না ওঠা অবধি। কিন্তু হেরম্ব খুড়ার বাড়িটা বর্ষার শুরু হতে জল টেনে না যাওয়া পর্যন্ত একেবারে আলাদা হয়ে থাকে। যেন জলের উপরে ভাসে বাড়িখানা।

খুড়া গরিব মানুষ; পাশের গ্রামের বাজারে এক দোকানে মুহুরির কাজ করেন। স্ত্রী চিররুগ্‌ণা। বড়ো মেয়ে জাফ্‌রানী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী। ফর্সা রঙ, ছেঁচা গড়নপিটন। লম্বা চওড়ায় প্রকাণ্ড মনে হয় তাকে। বিয়ে হয়েছিল, একটি পুত্রও হয়েছে, স্বামী আর খবর নেয় না। বাপের বাড়িই বাড়ি তার এখন। মা'র হাসিখুশি জাফ্‌রানী

বইন বাড়িতে থাকেন না, এ পাড়া ও পাড়া ঘুরে ঘুরে বেড়ান। পাড়ার যত খবর থাকে তাঁর কাছে।

জাফ্‌রানীকে প্রয়োজনও হয় লোকের বাড়িতে বাড়িতে। কারো বাড়ি ক্রিয়াকর্ম বিবাহ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খাওয়াদাওয়া নিতা-নিমন্ত্রণ হলেই ডাক পড়ে জাফ্‌রানীর। তাঁকে নইলে চলে না তখন। জাফ্‌রানী বইন কোমরে আঁচল জড়িয়ে বড়ো বড়ো ভাতের হাঁড়ি নামান, গামলাভরে ডাল ঢালেন, কড়াইভরা মাছ রাঁধেন। গায়ে জোর আছে, অনায়াসে করেন সব। হাসিমুখে করেন।

আবার পরদিন যখন কাজের শেষে বাড়ির সবাই আপন আপন ভাব নিয়ে ব্যস্ত, জাফ্‌রানীর দিকে চেয়ে দেখার কথাও ভুলে যায়, তখনো জাফ্‌রানী হাসি মুখেই বাড়ি ফেরেন। ক্রিয়াকর্মের বাড়ি, কাজ সারতে সারতে রাত হয়ে যায়, মা'র বাপের বাড়ির উপর দিয়েই পথ, যাবার সময়ে জালিজানালার ফাঁক দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে যান সে কথা। হাসতে হাসতেই বলেন।

হেরম্ব খুড়ার বাড়ি থেকে আর-একটু পুবদিকে 'পুবের বাড়ি'। এই প্রান্তে গ্রামের এই-ই শেষ বাড়ি। পুবের বাড়ির পরে খোলা সর্ষেক্ষেত, মটরক্ষেত। তার ওধারে নারান ভুঁইমালীদের বাড়ি। ছোটোখাটো একটা পাড়া। অত দূরে যেতে পাই না কখনো। পুবের বাড়ির উঁচু পুকুরপাড়টার উপরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি সেদিকে। গাছপালার ভিতর দিয়ে ঘরের চালগুলি একটু দেখা যায়, যায় না; মনে হয় না-ছোঁওয়া না-দেখা কী এক রহস্য যেন আছে ক্ষেতের ধারের দূরের ঐ পাড়াখানা ঘিরে।

পুবের বাড়ির মা'র সুশীলা পিসিকে ভালোবাসে না, ভক্তি করে না এমন কেউ নেই এ গ্রামে। শান্ত কোমল বৃদ্ধা, ধীরে চলেন, ধীরে কথা বলেন। অন্যায় অবান্তর কথা নেই তাঁর মুখে। কেউ কারো সম্বন্ধে কটুবাক্য বললে সুশীলা পিসি অন্তরে ব্যথা পান, দু কানে হাত চাপা দেন। বলেন, 'এমন কথা বলতে নেই, শুনতে নেই। বলা শোনা দুয়েতেই পাপ।'

পুবের বাড়িই সুশীলা পিসির বাপের বাড়ি। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সেই অবধি এখানেই আছেন। দেহের রঙে গড়নে প্রমাণ দেয় এককালে লাবণ্যবতী ছিলেন। শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ছিল ভালো, বিধবা হবার পর নিঃসন্তান পিসি বেশ কিছু টাকা ভাগে পেয়েছিলেন। মা বলেন, 'সুশীলা পিসি টাকা পেয়েছিলেন যেমন, সেই টাকার সদ্ব্যবহারও করেছেন তিনি। হেন তীর্থ নেই না করেছেন, কুলগুরুকে বাড়ি করে দিয়েছেন, বট-পাকুড়ের বিয়ে দিয়েছেন, বাড়িতে শিব স্থাপন করেছেন; আর অন্য দান-ধ্যানের তো হিসাবই নেই।'

পুবের বাড়িতে এলে প্রথমেই নজরে পড়ে উঁচু ভিতের উপরে লোহার শিক ঘেরা, উপরে টিনের চাল দেওয়া সাদামাটিতে লেপা একটি শুচিশুভ্র ঘর। ভিতরে শিবলিঙ্গ বসানো। ঘরের পাশে একটি বিল্ববৃক্ষ, গোড়া ঘিরে মাটির চওড়া বেদী। ঘরের সামনে পরিষ্কার আঙিনা একটি। শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ। এলেই মনে হয় বসে থাকি এখানে। এইটিই সুশীলা পিসির স্থাপিত শিবমন্দির। গ্রামের লোক মানত্-করা পুজো দিতে আসে এখানে। পুবের বাড়ির 'বাইরবাড়ি'র দিক এটা। তার পর বাড়ির ভিতর দিক।

পুবের বাড়িতে দুই শরিক; সুশীলা পিসির নিজের এক ভাই, আর জ্যাঠতুতো এক ভাই। পুব পশ্চিম দুই ভিটা দুই ভাইয়ের। পুবের ভিটায় থাকেন সুশীলা পিসির নিজের ভাই— মা'র ধনখুড়া। ইনিও খুব ধার্মিক স্বভাবের লোক, দিদির উপযুক্ত ভাই। এ বাড়ির ধনখুড়া ধনখুড়ি তাঁদের দুই পুত্র জিতেন ধীরেন, দুই কন্যা সুনীতি নলিনী— সবাই বড়ো ভালো। নলিনী আমার বয়সী, সুনীতি দিদির বয়সী। আমরা সব খেলার সাথি।

আর পশ্চিম ভিটা মা'র ফুলখুড়ার। ফুলখুড়া ছিলেন ধনখুড়ার ছোটো। ফুলখুড়া অনেকদিন আগে মারা গেছেন। বিধবা ফুলখুড়ি তাঁদের ছয়-সাতটি পুত্রকন্যা বড়ো করে তুললেন এই কয় বছরে। মেয়েদের বিয়ে দিলেন, ছেলেদের কাজে ঢোকালেন সদরে মহকুমায়; ক্ষেতখামার দেখা, সংসারের খরচপত্র চালানো—সব করেন খুড়ি ভাসুরের সাহায্য নিয়ে।

শ্যাম্লা রঙ, ছিমছাম দেহ ফুলখুড়ির। আর মুখখানি— মা বলেন, 'ফুলখুড়ির মুখখানা কাটের মুখ।' সত্যিই যেন কালো পাথর কুঁদে কাটা মুখ।

মা'র ফুলখুড়ি— আমার ফুল দিদিমা। দিদি নাতনীর সম্পর্কই আলাদা। ফুলদিদি মুখে মুখে ছড়া কাটেন। আমাদের পেলেই রসের ছড়া কেটে শোনান। লজ্জা দেখাবার একমাত্র উপায় পালিয়ে যাই সেখান থেকে। খানিক ঘুরেফিরে আবার আসি তাঁর কাছে ঐ ছড়ারই আকর্ষণে। তিনি হেসে হেসে আরো ছড়া কাটেন, আরো ছুটে ছুটে পালাই। নিত্য নতুন ছড়া শুনি তাঁর মুখে।

এই দুই ভায়ের পরিবারের প্রতি সমান স্নেহ সুশীলা পিসির।

সুশীলা পিসি সারাক্ষণ মালা জপেন, বলেন, 'এ থামালেই তো সাত পাঁচ নানা কথা বলতে হয়। তাতে লাভ কি?'

বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়েছেন, চোখেও দেখেন কম। একেই ধীর শান্ত মানুষ, তাই চলাফেরা এখন আরো ধীরে অতি সাবধানে করেন।

মা বাপের বাড়ি এলে সুশীলা পিসি রোজ ভোরে ফুলের সাজিখানা হাতে করে চলে আসেন এ বাড়িতে। মা মামীরা প্রণাম করেন, বসতে আসন পেতে দেন। মামারা সাজি ভরে জবাফুল ধুতুরাফুল তুলে দেন, 'কোটা' দিয়ে ডাল নুইয়ে স্থলপদ্মের দিনে স্থলপদ্মও তোলেন। মা'র সঙ্গে দু-চারটে কথা-বার্তার পর পিসি ওঠেন। মা সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে পথে তুলে দিয়ে আসেন।

মা'র বাপের বাড়ির দক্ষিণে পুবে বাড়ি মাত্র এই কয়খানাই।

৪

তুলসীমণ্ডপ থেকে পশ্চিমদিকে একটা পায়ে-চলা পথ চলে গেছে নন্দীদের বাঁধানো ঘাটের উপর দিয়ে পাড়ার ভিতরে।

দক্ষিণ-পুবের বাড়িগুলি যেমন পথে খালে আলাদা করা, এ দিকটায় তা নয়। কমবেশি উঁচু নিচু জমি হলেও বাড়িগুলি সব একই ডাঙায়।

পশ্চিম ভিটায় মামীদের আমিষ রান্নাঘরের পিছনের খানিকটা জায়গা গাছ-গাছড়ায় ভরা, বনের মতো অনেকটা। বেশির ভাগই আমগাছ আকাশ-জোড়া, তলা বুনো ঝোপে ভরা। আলোর রশ্মি পড়ে না মাটিতে দিনের বেলাতেও। এরই ভিতর দিয়ে কিছুটা গেলে এ বাড়ির উঠোন থেকে পাশের বাড়ির উঠোনে গিয়ে পড়ি। ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে এই যে একটুখানি পথ এ শুধু এই দুই বাড়ির লোকের পায়ে পায়ে তৈরি। বর্ষায় যে ঘাস জন্মায় পথে, পায়ের চাপে সেখানে থেঁত্‌লে সেখানেই মাটি হয়ে থাকে।

দিনে কতবার এ বাড়ির মেয়ে-বউ যায় ও বাড়িতে, ও বাড়ির ওরা আসেন এ বাড়িতে। ডাল ফুটছে কড়াইতে, ফুটুক;— ও বাড়ির বউ এসে সেই অবসরে খানিক গল্প করে গেলেন এ বাড়ির রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে মামীদের সঙ্গে। মামীরাও ভাতের হাঁড়ি উনুনে চাপিয়ে কচুশাক, কাঁচাহলুদ তুলবার ছল করে বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে গল্প করে আসেন সমবয়সীর সঙ্গে। গোপনে চলে এই যাওয়া-আসা। প্রকাশ্যে যাই আমরা ছোটোরা— যান দিদিমা, মা, মাসিরা।

এই বন-বাগানের পথের ধারে আছে একটা বিরাট জামরুল গাছ। জামরুলের দিনে থোকা থোকা সাদা জামরুল ধরে থাকে গাছ ভরে। রাত্রে বাদুড়ে খাওয়া জামরুলে ছেয়ে থাকে তলা। আমরা পেড়ে খাই, পাড়ার ছেলেমেয়েরা পাড়ে, বড়োরা ধামা ভরে পেড়ে নিয়ে যান। এত জামরুল রোজ যায় গাছ থেকে তবু মনে হয় এ যেন আর ফুরোবে না কোনোদিন।

এই ফালি জমিটুকু নন্দীদের। নন্দীরা এ গ্রামের জমিদার। ইঁটে গাঁথা দালান বাড়ি। এই একটিই পাকা বাড়ি এ গ্রামে। দোতলা বাড়ি; বালির আস্তর নেই বাইরের দিকটাতে, ফলে শ্যাওলা ছেয়ে বটের চারা ঘাস লতা গজিয়ে কেমন-একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব বাড়িটার।

এখন যিনি এ বাড়ির কর্ত্রী তিনি মা'র সুন্দর বোঠান। ভাশুর থাকেন কলকাতায় আপন স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে। ইনি ছোটো ভায়ের স্ত্রী, স্বামীহারা। দেশের জমি পুকুর যা আছে তার আয় থেকেই সংসার চলে সুন্দর বোঠানের। দুটি পুত্র তিনটি কন্যা নিয়ে বিধবা হন। সুন্দর বোঠান সুন্দরী তো বটেই, তা ছাড়া অতিশয় বুদ্ধিমতী আর অত্যন্ত পরিশ্রমী। কাজকে কখনো অবহেলা করতে বা ভয় পেতে দেখি না তাঁকে। রান্নাঘরের ভিতের ধারের মাটি ধসে গেছে খানিকটা, বর্ষার জলে মেঝে ভিজে ওঠে— কাম্‌লা কামিন কাকে আর ডাকাডাকি করবেন, হাতের কাছে কাকে পাবেন বা না পাবেন নিজেই দেখ-না-দেখ পাশের ঝোপ থেকে মাটি কেটে কয়েক ঝুড়ি মাটি এনে ফেলে দিলেন ভিতের ধারে ধারে। আবার বৈঠকখানায় খাজাঞ্চির কাছ থেকে ধান পাট বিক্রির টাকা, খাজনার হিসাব সব-কিছু বুঝে নেন, সেও সুন্দর বোঠান নিজেই।

ননদ ননদাই ভাগ্নে ভাগ্নী জ্ঞাতি শরিক নিয়ে বড়ো সংসার তাঁর। বড়ো সংসারের বহু ঝামেলা ; কিন্তু সুন্দর বোঠানের বলিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত সে চেহারাতে রাগ দেখি না কোনোদিন।

সুন্দর বোঠানের ঠাকুরজামাই হলেন ঘর-জামাই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে তিনি শ্বশুরালয়েই থাকেন বারোমাস। এ বাড়ির নায়েব ইনি। ছোটো ছিপছিপে নিরীহ মানুষ; বৈঠকখানাতেই থাকেন সারাক্ষণ। যখনই এ বাড়ির সামনের পথ দিয়ে যাই দেখি মেঝের অর্ধেক জোড়া ফরাসের উপরে একটা কাঠের ডেস্কের সামনে বসে আছেন তিনি। শশী তাঁর স্ত্রীর নাম। মা বলেন, 'শশীর দাপটে ও আর মুখ খুলতে পেল না জীবনে।'

মা'র শশী বইন-এর গলার খুব জোর। গানের গলা ছিল তাঁর। গান যখন করেন এক পাড়া থেকে আর-এক পাড়া চলে যায় গলা। মা প্রায়ই তাঁকে সামনে বসিয়ে শ্যামাসংগীত শোনেন।

বেশ বয়স হয়েছে শশী বইনের, বিয়ের যুগ্যি মেয়ে ঘরে তাঁর, তখনো তিনি জোলাদের বোনা মোটা সুতোয় তৈরি রঙিন ডুরে শাড়ি পরেন। হাঁটুর কাছাকাছি

তুলে আঁটসাট করে পরা শাড়ির লাল নীল কালো হলুদের চওড়া চওড়া ডুরেগুলি দেহ ঘিরে থাকে, বেশ লাগে দেখতে।

শশী বইনের মেয়ে সুনীতি— সবাই ডাকে 'সুনোতি' বলে, তার ডাক নাম 'খাঁদি'। সুনোতি বড়ো হয়ে উঠেছে, বিয়ে দিতে হবে। সবাই ভাবনায় পড়েন। হঠাৎই যেন বড়ো হয়ে উঠল সুনোতি, যেমনি লম্বায় তেমনি চওড়ায়। এর উপরে গায়ের বর্ণ কালো। পাত্রপক্ষ দেখতে আসে, দেখে চলে যায়, আর আসে না। মা আড়ালে দুঃখ করেন, মামীরা বলেন, 'যা কুৎসিত দেখতে'। শুনে অবাক হই, সুনোতি দিদির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি— এই তো নাক মুখ চোখ কপাল ঠোঁট থুতি। কুৎসিতটা কোথায়?

এই সুনোতি দিদির বিয়ে হয়ে গেল একদিন। শ্বশুরবাড়ি ঢাকায়। বর কালো হলেও লম্বা সুপুরুষ। সুনোতি দিদি দ্বিরাগমনে এসে হেসে হেসে কত গল্প বললেন শ্বশুরবাড়ির। তার চ্যাপ্টা মুখখানিতে চাপা নাকের উপরে সোনার 'মরিচফুল'টি কী সুন্দর লাগল দেখতে।

নন্দীবাড়িতে আরো এক শরিক আছেন— খুসীর মা। বংশানুক্রমে ধনজন ক্ষয় হতে হতে এখন শুধু সম্বল পশ্চিম ভিটার মাটির ঘরখানা, আর বিঘা কয়েক ধানের জমি। বিধবা মা পিতৃহারা কন্যা খুসী ও পুত্র নিধিকে নিয়ে যতটা পারেন নির্ঝঞ্ঝাটে থাকেন, কম কথা বলেন। খুসীও তার মার মতোই ধীর শান্ত মেয়ে। ছিপছিপে লম্বা, গৌরবর্ণ দেহ, মাথাভর্তি কোঁকড়া কালো চুল— এক কথায় খুসী সুন্দরী। সুনোতি দিদিকে পাত্রপক্ষ কেউ দেখতে এলে খুসী দিদিকে লুকিয়ে রাখা হত। খুসী দিদিকে দেখতে পেলে কি আর সুনোতি দিদিকে নজরে ধরবে কারো? সবাই বলত, খুসীর বিয়ে নিয়ে ভাবনা নেই, ওকে সেধে নিয়ে যাবে।

সেই সেধেই নিল একদিন খুসী দিদিকে দুই গ্রাম দূরের গ্রামের এক স্কুলের হেড্‌মাস্টারমশায়। গুণী জ্ঞানী গম্ভীর ভদ্রলোক। মাঝবয়সী। দোজবর। আগের পক্ষের চারটি পুত্রকন্যা। মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালনের তাগিদেই আবার বিবাহ করলেন। হেড্‌মাস্টারমশায় খুসী দিদির চাইতে অনেক বড়ো, আর দেহে মনেও ভারিক্কি।

নিঃসম্বল বিধবার মেয়ে খুসী দিদি এতেই খুশি। নতুন বিয়ের পর মেয়ে-জামাই এসেছে, বয়স্ক দোজবর জামাই সম্বন্ধে সবার কৌতূহল, খুসী দিদিকে ঘিরে তারা হাসি তামাশা জুড়ে দেন, নানা প্রশ্ন করেন। খুসী দিদি লাজনম্র হাসি হেসে মুখখানা নিচু করেন।

পরে কিন্তু সবাই স্বীকার করেন খুসীর স্বামীভাগ্য সত্যিই ভালো। বিচক্ষণ স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি, খুসী দিদির মা-ভাইকে আগলে নিয়ে রইলেন তিনি স্নেহময় অভিভাবকের মতো।

নন্দীবাড়ির সামনের দিকে বৈঠকখানা ঘর। বৈঠকখানার পরে বাঁধানো ঘাট পুকুরের পাড়ে। এ পাড়ায় এইটিই সবচেয়ে বড়ো পুকুর। বৈঠকখানা আর ঘাটের মাঝখান দিয়ে লোকের চলতি পথ।

বৈঠকখানার সামনে বাহির বাড়ির আঙিনা, আঙিনার বাঁ দিকে দুর্গামণ্ডপ। প্রতি বছর দুর্গাপূজা হয় এখানে। দুর্গামণ্ডপ থেকে পশ্চিমমুখী দু পা এগিয়ে বাঁহাতি একটা পোড়ো মাটির ঢিবির উপরে একটি ঝুম্‌কোজবার গাছ। পুরাতন গাছ। শক্ত গাছের গুঁড়ি, শক্ত তার ডালগুলি। এই গাছ ভরে শত শত ঝুম্‌কোজবা ফুটে থাকে রোজ।

জবার মতো লাল টক্‌টকে রঙ নয় এ ফুলের; এর গায়ে সাদায় লালে ভাঙা ভাঙা রেখা টানা— পাঁচ পাপড়ির ফুল। হালকা পাপড়ি। ফুলটি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিকে উলটে যায় পাপড়িগুলি। যেন হাত পা গুটিয়ে আগে হতেই আল্‌গা হয়ে ঝোলে বোঁটার মুখে। রেণু নিয়ে লম্বা শিষটি বেরিয়ে থাকে ফুলের মাঝখান থেকে। বড়ো সুকুমারী ভাব ঝুম্‌কোজবার। যেন সাদা ডুরে দেওয়া পেঁয়াজ রঙের শাড়ি পরা কচি কোমল কিশোরী এক। গাছ থেকে একে তুলে রাখলে থাকে না বেশিক্ষণ, নিজেকে সংকুচিত করে ফেলে।

সকালবেলা সব-কিছুর আগে ছুটে আসি এই ঝুম্‌কোজবা গাছের কাছে পূজার ফুলের সাজি হাতে নিয়ে। আসে পাড়ার মেয়েরাও।

হাত বাড়িয়ে ঝুম্‌কোজবা তুলি, ডাল টেনে ধরে নামিয়ে তুলি, ডাল বেয়ে গাছে উঠে তুলি— ঝুমকোজবায় উপ্‌চে ওঠে সবার সাজি, তবু থামে না আমাদের ফুল তোলা। ফুলের মাঝখানে যে সরু শিষের মুখে এক গোছা পুষ্পরেণু, কুঁড়ির মধ্যে সেটা আরো জমাট, আরো হলদেটে। আমরা কুঁড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে সেটা দিয়ে নাকে নোলক পরি। আঠার মতো একটু রস আছে এতে; নাকের নীচে বেশ আট্‌কে থেকে ঝোলে। যেন টেপা টেপা সোনার এক-একটি নোলক দোলে আমাদের সকলের নাকে। এ এক মজা আমাদের। মাথা নাড়ি, নোলকটিও দোলে আমাদের ঠোঁটের উপরে।

এমনিতরো রোজ কত ফুল তুলি, কত কুঁড়ি ছিঁড়ি। পরদিন আবার যখন আসি ভোরে, দেখি গাছ ভরে ঝুম্‌কোজবা হাসছে।

এই ঝুমকোজবার কী এক আকর্ষণ আমার— দিনের বেলা কত সময়ে একা এসে দাঁড়িয়ে থাকি তলায়, ডালগুলি ধরি, মাথার উপরে উঁচুতে যে ফুলটা ঝুলছে একমনে তাকে দেখি। শক্ত গুঁড়িটাতে হাত বুলোই। মনে হয় কী যেন একটা কথা আছে আমাদের দুজনের দুজনকে বলবার; কিন্তু বলতে পারছি না কেউ।

৫

ঝুমকোজবার গাছ হতে দক্ষিণে খানিকটা ঢালু পথ পেরিয়ে গোবিন্দার মা'র বাড়ি। প্রৌঢ়া বিধবা, দুঃখী মানুষ। গোবিন্দা সেই কবে তাঁর কোলে এসেছিল— কবে চলে গেছে; নামটুকু শুধু দিয়ে গেছে মাকে।

একা মানুষের সংসার— তবু একটা খরচ আছে। হাত পাততে পারেন না গোবিন্দার মা কারো কাছে। সংকোচে কুণ্ঠায় কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যান। শাকপাতা কচুর লতিটা বন-বাদাড় পুকুরের ধার হতে খুঁজেপেতে তুলে আনেন, তাই রান্না করেন। আর, ডাকতে এলে কারো বাড়িতে চালটা চিঁড়েটা কুটে দেন। আসবার সময়ে আঁচলে করে খুদকুঁড়োটুকু নিয়ে আসেন। গৃহিণীরা খানিকটা চাল ধরে দেন ডালাতে করে। এই করেই দিন কাটে গোবিন্দার মা'র।

মুড়ি ভাজা হবে, দিদিমা একদিন এলেন তাঁকে ডাকতে। সঙ্গে আমি। দুপুরবেলা। গোবিন্দার মা খেতে বসেছেন রান্নাঘরে। ঝাঁপতোলা ঘর। খোলা ঝাঁপের সামনে বসে বসে কথা বলছেন দিদিমা, ভিতরে কানা-উঁচু একখানা পাথরের থালা সামনে নিয়ে গোবিন্দার মা। গোবিন্দার মা'র খাওয়া হয়ে গেছে তবু ওঠেন না। কী বুঝে দিদিমা তাড়াতাড়ি উঠে চলে এলেন আমাকে নিয়ে। মা'কে এসে চুপিচুপি বলতে শুনলাম— তাইতেই আমিও বুঝলাম। দেখেছিলাম গোবিন্দার মা'র থালার কাছে একটা কাঁসারিতে ভাতের ফেন খানিকটা। ভাতের ফেনটুকুও খাবেন তিনি পেট ভরাতে, তাই উঠতে পারছিলেন না 'পাত' ছেড়ে। দিদিমার সামনে খেতেও পারছিলেন না লজ্জায়। বিধবা মানুষ; দিনে একবার মাত্র ভাতের এঁটো খাওয়ার নিয়ম। একবার পিঁড়ি ছেড়ে উঠলে আর খাওয়া হবে না এদিন। পিঁড়ি ছেড়ে ওঠা মানেই ঠাঁই নাড়া হল; দুবার ভাতের এঁটো খাওয়ার দোষ হল বিধবার। বুঝতে পেরে দিদিমা তাই তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলেন সেখান থেকে।

গোবিন্দার মা'র বাড়ি থেকে আর-একটু দক্ষিণে সিঙ্গিদের বাড়ি। হরি সিং ছিল বাড়ির কর্তা এককালে। হরি সিং-এর পরে তার চার ছেলে ভিন্ন হয়ে যে

যার ঘর তুলেছে আলাদা আলাদা ভিটায়। হরি সিং-এর বুড়ি স্ত্রী থাকে তার আদি ঘরে।

এ গ্রামের মেয়েরা বিয়ের পরে যখন শ্বশুরবাড়ি যায়, সিংদের কোনো এক সিং যায় সঙ্গে। এই-ই নিয়ম। মা'র সঙ্গে গিয়েছিলেন হরি সিং ভাই নিজে।

হরি সিং ভায়ের চার ছেলের তিন ছেলে থাকে এখানে, তাদের পুরো সংসার নিয়ে। মেজোছেলে থাকে কলকাতায় একা, বউ মেয়েকে এখানে রেখে। বাচ্চা মেয়ে, এই সেদিনও দেখলাম নাকে সোনার ফুরফুরি, কোমরে রুপোর বটফল— হেলেদুলে মেয়ে উঠোনময় চলে বেড়াচ্ছে, এরই মধ্যে কতটা লম্বা হয়ে উঠেছে। এখন কোমরে গিঁট দিয়ে লাল লম্বা গামছাখানা শাড়ির মতো করে পরে। ভাবখানা যেন শাড়ি পরার মতো লায়েক হয়ে উঠেছে। নাম জয়া। কি জানি কি এক গোলমাল হয়েছে জয়ার মা-বাবার মধ্যে, লোকে বলাবলি করে জয়ার বাবা কলকাতায় গিয়ে আবার বিয়ে করে সেখানেই ঘর-সংসার পেতেছে। এই মেয়ে-বউকে ত্যাগ করেছে!

লোকে অবাক হয়। — এমন যে সুন্দরী বউ, তাকে ত্যাগ করতে পারে স্বামী কোন্ প্রাণে!

জয়ার মা শৈবলিনীর রূপ— এমন রূপ দুর্লভ। লম্বা ঘোমটা টানা থাকে তার মুখে, ঘোমটার ফাঁকে যখন যেটুকু দেখি— বিস্ময় বাড়ে। ছোটোরা ভয়ে কেউ কাছ ঘেঁষে না তার। একদিন কোন্ সাহসে ঢুকে পড়ি তার ঘরে। মেজোবউ খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বসে কথা বলল। যতক্ষণ কথা বলল চোখ ফেরাতে পারলাম না তার মুখ থেকে। রঙ যে খুব টক্‌টকে গৌরবর্ণ তা নয়। বরং মাটিচাপা হলুদ যেন। কিন্তু মুখ চোখ দেহসৌষ্ঠব— এর আর তুলনা পাই না। এ মুখের তুলনা দিতে গেলে কেবল চাঁপাফুলের পাপড়ির কথাই মনে হয়। তেমনিতরো সূক্ষ্ম হালকা সৌন্দর্য যেন সারাটি মুখে তার। পাতলা দুটি ঠোঁট, সরু নাক, তেমনি থুতিখানি, তেমনি কপাল, ভুরু, চোখ। ভার নেই কোথাও, যেন এক-একখানি চাঁপার পাপড়ি বসানো সব জায়গাতে। হাসিখানিও তাই, যেন হালকা হাওয়ার সুরভি মাখা।

পরিপাটি করে সাজানো ঘর তার, কোথাও একটু ধুলোবালি নেই। খাট, আল্‌না, বেড়ার গা— সবার উপরে নিখুঁত একখানি হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে। রূপের ডালি শৈবলিনীর ঘরে অবিন্যস্ত বলে কিছু নেই। ভেবে পাই নে এ-হেন ঘরে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে ভেঙে তছ্‌নছ্ করে দিতে পারে কোন্ ফাঁক দিয়ে?

নন্দীদের পুকুরের পশ্চিম পাড়টার ঠিক উপরেই এই সিঙ্গিদের বাড়ি। মেজোবউ এঁটো বাসনের পাঁজা নিয়ে পশ্চিম পাড়ের ঘাটে বাসন মাজতে বসে রোজ একহাত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

এক-একদিন বাসনমাজার তালে তালে ঘোমটার ভিতর মাথাটা নড়ে সজোরে, আর তারও অধিক জোরে তালে মেজোবউয়ের গলার স্বর ভেসে আসে জল পেরিয়ে। ভাষায় বোঝা যায় মেজোবউ তার জা শাশুড়ি দেওর ভাসুর এমন-কি, মৃত শ্বশুরকে পর্যন্ত হরেক কথা শুনিয়ে ছাড়ছে। কী নিয়ে এদের ঝগড়া শুরু হয় জানি না; কিন্তু হয় প্রায়ই। সকাল হতে ঝগড়া চলতে চলতে ঝগড়া যখন ঘাটপাড়ে এসে নামে, মেজোবউয়ের সে উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর পুকুরের জল কাঁপিয়ে দক্ষিণ উত্তর পুব তিন পাড় বেয়ে উঠে এসে ছড়িয়ে পড়ে চার দিকে। সকলে সচকিত হয়ে ওঠে, বলে— 'ঐ রে, ঐ সিঙ্গিবাড়ির মেজোবউয়ের গলা ছুটেছে'। এ গলা একবার চড়লে আর নামে না সহজে।

এই হরি সিং ভায়ের ছোটোভাই জগমোহন সিং একবার অনেক টাকা পেয়ে গেলেন লটারিতে। চিনিমামীর ভাই সুধাময় মামা আলুর ব্যবসা করেন পোস্তায়। জগমোহন সিং কাজ করেন তাঁর দোকানে। একদিন সুধাময় মামা জোর করে একটা একটাকার টিকিট গছিয়ে দিলেন জগমোহন সিংকে। একটা টাকা পুরো লোকসান গেল—জগমোহন বড়ো দুঃখ পান মনে।

তার পর একদিন এই টিকিটেই পেয়ে গেলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। টাকা পেয়ে বসতবাড়ি ছেড়ে আলাদা বাড়ি তুললেন। টাকা দিয়ে কুলীনের ঘর থেকে মেয়ে এনে ছেলেদের বিয়ে দিলেন। পদবী বদলে 'দে' পদবী নিলেন। সমাজে জাতে উঠলেন। প্রায় লক্ষটাকার মালিক জগমোহন সিংকে এখন গ্রামের লোকে বলে লাখাই সিং। তাঁর বাড়িকে বলে লাখাই বাড়ি।

ঝুম্‌কো জবা গাছের উত্তর দিকে দু পা এগিয়ে কবিরাজ খুড়ার বাড়ি। কবিরাজ খুড়ার আসল নাম দীননাথ; কিন্তু 'কবিরাজ' নামই তাঁর চালু এ-গ্রামে ও-গ্রামে।

কবিরাজ খুড়ার কালো ভরাট মুখে সাদা মোটা একজোড়া গোঁফ। এই গোঁফজোড়াতে অতি গুরুগম্ভীর দেখায় তাঁকে। কবিরাজ খুড়া বাড়িতেই থাকেন সর্বক্ষণ, গাঁয়ে ঘোরাঘুরি করেন না বড়ো একটা। কেবল মা এলে সকাল-সন্ধ্যায় হুঁকো টানতে টানতে একবার করে এসে দাঁড়ান উঠোনে, খবরাখবর নেন, চলে যান। মামীমারা জলচৌকি বের করে তার উপরে হাতেকরা ফুলকাটা আসন বিছিয়ে দেন বসতে; কিন্তু তিনি বসেন না।

তাঁর বাড়িতে যে ঘরে তিনি থাকেন সেই ঘরের সামনের দাওয়াটা কাঠের রেলিঙ দিয়ে ঘেরা। একপাশে সাজানো থাকে একসারি বাঁধানো হুঁকো পিতলের হুঁকোদানির উপরে। তাঁর নিজের হুঁকোটি রুপো দিয়ে বাঁধানো। এই হুঁকোটির প্রতি অতিশয় যত্ন তাঁর। হুঁকোর নারকেল মালার খোলটা যেমন কালো কুচ্‌কুচ্‌ করে তেমনি চক্‌চক্‌ করে সাদা রুপোর নকশাটা সেটার গায়ে।

গ্রামের কোনো কালো জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে ধোপদুরস্ত সাদা ধবধবে ধুতি পাঞ্জাবি পরে— মামীরা ঠাট্টা করে বলেন— 'ইস্‌, এ যে একবারে কবিরাজ খুড়ার হুঁকাখান দেখি'।

তামাক খাবার শখ ছিল কবিরাজ খুড়ার; আর ছিল শখ পাশা খেলার। বিকেল হলেই পাটি বিছিয়ে পাড়ার সত্য ঘোষের সঙ্গে দাওয়ায় বসে পাশা খেলতে শুরু করে দেন। পাশার কাঠিগুলি হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে কবিরাজ খুড়া হঠাৎ এক সময়ে একটা হুংকার দিয়ে কাঠিগুলি মাটিতে গড়িয়ে দেন। দেখে মনে হয় যেন একটা দাপাদাপির খেলা; এ খেলার বুঝি এই-ই নিয়ম। কাছে যাই না কখনো।

কবিরাজ খুড়া কবিরাজি করেন না, তবু কেন যে এই নাম হল কি জানি। তবে কারো বাড়িতে অসুখ হলে টোট্‌কাটাট্‌কিতেও যখন রোগ সারে না তখন কবিরাজ খুড়াকে ডাকা হয়। তিনি এসে বলেন, 'হারান ডাক্তারকে আনাও এবারে— রোগীর বগলের ফোড়াটা কাটতেই হবে দেখছি'; অথবা বলেন, 'এই কাম্‌লা জ্বরের লক্ষণ ভালো দেখছি না, গোঁসাই কবিরাজকে খবর দাও'। দূর দূর গ্রাম থেকে তখন ডাক্তার কবিরাজ আনানো হয়। এ বিধানটা কবিরাজ খুড়াই দেন রোগের সংকটকালে।

কবিরাজ খুড়ার স্ত্রীর নাম রাইকিশোরী। দিদিমারা ডাকেন 'রাই বলে, মা'রা ডাকেন রাইখুড়ি। মা-মামীরা এই রাই নাম নিয়ে ঠাট্টা তামাশাও করেন মাঝে মাঝে, খুড়ার কথাও টেনে আনেন এ প্রসঙ্গে। রাইখুড়ির পাতলা দুটি ঠোঁটের চাপা হাসিতে একটা গরবিনীভাব ফুটে ওঠে।

রাইখুড়ির রঙ ঘন শ্যামবর্ণ; ছোটোখাটো হালকা মানুষ ফুরফুর করে চলেন ফেরেন। রাইখুড়ির মুখখানা কাটের মুখ নয়; কিন্তু লাবণ্যে ভরা। তাঁর শ্যামল মুখে ঠোঁটের ডানদিকে একটি বড়ো কালো আঁচিল, এই আঁচিলটির জন্য যেন আরো ভালো লাগে দেখতে তাঁকে।

নিজ নামের মান রেখেছিলেন রাইখুড়ি। হাসি রঙে সর্বদা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে থাকে তাঁর। এ গ্রামের বধূ ইনি। এতখানি বয়েস হয়েছে তবু বউ বউ ভাবখানি লেগে আছে স্বভাবে।

একটি পুত্র ছিল, বহুকাল আগে মারা গেছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, সে মেয়েও গেছে। মেয়ের ঘরে একটিমাত্র নাতনী— জ্যোৎস্না— তাকে বড়ো করে বিয়ে দিয়েছেন। সে থাকে তার শ্বশুরবাড়িতে। সন্তানদের জন্মের সময় প্রতিবারই সে আসে দিদিমার কাছে। শিশুকে দু-তিন মাসের বড়ো করে নিয়ে ফিরে যায়।

তিন মেয়ের পর এবারেও সে যখন সন্তানসম্ভবা, এসেছে দাদাদিদির কাছে, সবাই বললে, 'দেখো, এবারে একটি ছেলে হবে জোছনার ঘরে।'

রাইখুড়ি বলেন, 'না গো না, ও কথা বোলো না। তিন মেয়ের পর ছেলে ভালো না; কথায় বলে— তিন ছেলের পর হয় ঝি, সংসারেতে ঢালে ঘি; আর— তিন মেয়ের পর হয় পুত্, সংসারে লাগে অদ্ভুত'।

তা সেবারেও মেয়েই হল আর-একটি। আঁতুড় ঘরের দোরে মেয়ে কোলে করে কাঁচুমাচু মুখে বসে থাকে জ্যোৎস্নাদিদি, রাইখুড়ি ঘরকন্নার কাজে এঘর ওঘর করতে করতে বারে বারে সান্ত্বনা দেন, বলেন— 'ভালোই হল, চার-এ সকল দোষ কেটে গেল। এবারে পঞ্চম গর্ভে সুসন্তান— পুত্রসন্তান আসবে তোর কোল আলো করে।'

কবিরাজ খুড়ার বাড়ির পশ্চিমে প্রায় গা-লাগা সত্য ঘোষের বাড়ি। বৃদ্ধ সত্য ঘোষ হাতে থেলো হুঁকো নিয়ে সারাদিন পাড়ার বাড়ি বাড়ি টহল দিয়ে বেড়ান। একটিও দাঁত নেই, তাঁর ফোকলা মুখের কথা বোঝা দায়; অথচ কথা বলার আগ্রহ বেড়েই চলেছে দিন দিন। মা'র কাছে বসে সত্য ঘোষ অনর্গল কথা বলে চলেন, আমরা দূরে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করি, মামীরা আড়ালে মুখে আঁচল চাপা দেন; আর মা হাতে কাজ করতে করতে 'হুঁ হাঁ' বলে সত্য ঘোষের কথার মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকান।

সত্য ঘোষের স্ত্রী দেহে আচরণে স্বামীর থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। গৌর বর্ণের মোটাসোটা মহিলা, সিঁথেয় চওড়া সিঁদুর, কপালে বড়ো সিঁদুরের টিপ, পরনে চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, মুখে পান; দুলে দুলে ধীর পায়ে চলে আসেন যখন— জায়গাটা যেন ভরে ওঠে জেল্লায়।

বড়ো ছেলের ঘরে দুই নাতনী তাঁর— সুন্দরী আর অতসী। দুই নাতনীই রূপবতী, যেমন রঙে, তেমনি শ্রীছাঁদে। এর মধ্যে অতসী আরো রূপসী। অতসী ফুলের মতো টক্‌টকে রঙ দেখেই তার নাম রাখা হয়েছিল 'অতসী'। মা তাকে দেখলেই বলেন, 'তোকে আমি দুদার বউ করব।'

দুদা আমাদের দুদুমামা, মা'র পঞ্চম ভাই দুদুমামার রঙও খুব ফর্সা। জন্মের পরে ছেলে দেখে সবাই বলল, 'ছেলে হয়েছে একেবারে দুধের মতো রঙ'। দুধ হ'তে নাম হল দুদা, আমরা ডাকি দুদুমামা।

মা অতসীকে 'দুদার বউ' বলে ডাকেন আর অতসী যাকে কাছে পায় তার পিঠের উপর পড়ে 'উঃ উঃ' করে নিজের মুখটা ঘষতে থাকে। বড়ো লজ্জা তার এ ডাকে। ওদিকে দুদুমামাও অতসীকে দেখলে পালিয়ে যান বাড়ি ছাড়া হয়ে।

ঘোষের বাড়ির তলা ঘেঁষে পশ্চিম দিকে একটা সরু খাল। টানের দিনে হাঁটুজল থাকে খালে, ছপ্‌ছপ্‌ করে পায়ে চলে পার হয় সবাই। এই খালটা দিয়েই বর্ষাকালে গাঙের জল সর্বপ্রথম এসে ঢোকে গ্রামে। টুবটুব্‌ জলে তখন ভরে ওঠে শুকনো খাল। এপার ওপার সাঁকো বাঁধা হয় বাঁশ দিয়ে। সাঁকোর তলা দিয়ে নৌকো চলাচল করে, উপর দিয়ে যায় এ পাড়ার লোক ও পাড়ায়, ও পারের লোক আসে এ পাড়ায়।

এই খাল দিয়েই গ্রামের দুই পাড়া আলাদা করা। আমাদের এদিকটা গ্রামের পুব পাড়া, ওদিকটা পশ্চিম পাড়া। পুব পাড়ায় মাত্র এই কয় ঘর গৃহস্থেরই বাস।

৬

দিদিমা আমার অতি সহজ সাদাসিধে, যাকে বলে মাটির মানুষ। রাগ করতে কখনো দেখি নি তাঁকে। কারো কথায় বা আচরণে যদি ব্যথা পেলেন প্রাণে, তবে পুবের ঘরের 'ছাইচে' গিয়ে নির্জনে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। নয়তো নাতি-নাতনী কাউকে কাঁখে নিয়ে— আমি কাছে থাকলে আমার হাত ধরে চলে এলেন গ্রামের বাইরে পুজোপাওয়া বহু পুরাতন বটগাছ— 'সিদ্ধেশ্বরী তলা'য়। এসে ছায়ায় বসে রইলেন— উন্মুক্ত বিস্তৃত দিগন্তছোঁওয়া আরইল-বিলের দিকে চেয়ে। আমি খেলা করি 'সিদ্ধেশ্বরী'র গুঁড়ি ঘিরে। কিছুক্ষণ কাটলে দিদিমা আবার বাড়ি ফিরে আসেন আমাকে নিয়ে।

দিদিমা বুড়িগণ্ডার বেশি গুনতে জানেন না। তাও গণ্ডা বলেন না, বলেন 'হালি'। এক হালি, দুই হালি, তিন হালি— বিশ হালি। এই বিশ হালির হিসাব দিয়ে দিদিমা শ' শ' নির্ভুল গুনে ফেলেন।

বাজারের হিসাব নেন দিদিমা মাটিতে দাগ কেটে কেটে। বাজার থেকে মামারা সওদা এনে জিনিসপত্র বুঝিয়ে দিলেন, কেনাকাটার হিসাব দিলেন, বাকি পয়সা যা বেঁচেছে তা ফেরত দিলেন। দিদিমা একটা কাঠি হাতে নিয়ে উঠোনের একধারে

বসলেন। মাটিতে কাঠি দিয়ে দাগ কেটে কেটে আপন মনে সমুদয় জিনিসের হিসাব বুঝে নিলেন। এ পদ্ধতি দিদিমার নিজের। এ কেবল তিনিই বোঝেন, আমরা বুঝতে পারি না। ছোটোমামা মাঝে মাঝে তাঁকে ঠকিয়ে দু-চার পয়সা এদিক-ওদিক করতে চাইতেন। দিদিমা ঠিক ধরে ফেলতেন। ছোটোমামার নাম করে বলতেন তিনি নাকি আলুতে দু পয়সা আর 'মইরচা' গুড়ে তিন পয়সা বেশি ধরে নিয়েছেন। দিদিমাকে পাঁচ পয়সা ঠকিয়েছেন।

দিদিমা কোন্ জিনিস কত পয়সার আনতে দিলেন, কত পয়সার জিনিস বুঝে পেলেন, কী করে যে তিনি পয়সার হিসাবে এত সব মনে রাখতেন— এটাই আশ্চর্য। বাজারে দিতেন টাকা-আনা বের করে; কিন্তু হিসাব নিতেন পয়সা ধরে।

রোদ দেখে ছায়া দেখে দিনের দণ্ড-পলের হিসাব রাখতেন দিদিমা। এ হিসাবে যন্ত্রের ঘড়ি হার মানে। বিশেষ বিশেষ ঘটনা দিয়ে দিন, মাস, বছর সব গোনা-গাঁথা তাঁর। সকলের জন্মক্ষণ নির্ভুল ধরা আছে তাঁর মনের খাতায়। দিদির জন্মক্ষণের বর্ণনা দেন দিদিমা, পুবের ঘরের পাশে পুরাতন লম্বা নারকেল গাছটা দেখিয়ে বলেন, 'শাওন মাসের পড়ন্ত বেলা— ঐ নারকেল গাছটার মাথার উপরে তখনো একটুখানি রোদ ঝিলিমিলি করে— ঠিক সেই সময়েই বুড়ি'র জন্ম'।

দিদির ভালোনাম অন্নপূর্ণা, ডাকনাম বুড়ি। দিদির জন্ম হয় এইখানেই।

ফল ফুল দিয়েও ছিল দিদিমার নানা কাজের হিসাব ঠিক করা। 'টিয়াঠুটি' গাছে আমের বোল ধরল তো শ্রীপঞ্চমী এসে গেল কাছে। লেবুফুল ফুটেছে, সৌরভে আঙিনা মাত্ করে তোলে সন্ধেবেলার হাওয়া, দিদিমা ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কণ্টিকারীর শিকড় আর জাঁতি দিয়ে পাঁচটুকরো করে কাটা হরতকীর মাঝের টুকরোটা সুতোয় গেঁথে বাড়ির ছোটোবড়ো সবার হাতে বেঁধে দেন। এই সময়টা মা-শীতলার দয়া হবার সময়; আগে হতে সাবধান হন দিদিমা। বসন্ত জলবসন্ত একবার শুরু হলে ঘরে ঘরে ঢুকে ছাড়ে।

আর আছে দিদিমার সময়ের হিসাব— ঝিঙাফুলে। বিকালবেলা বেড়ার ধারে ঝিঙাফুলগুলি ফুটে উঠলেই দিদিমা হাঁক দেন বউদের, চুলবাঁধার পাট সেরে নিতে। বলেন 'ঝিঙাফুল ফুটে গেল, বেলা আর বেশি নাই গো, সুয্যিঠাকুর পাটে বসবেন— তরন্ত কাজ সারো সকলে'।

এক ঝাঁক আলোর মতো উজ্জ্বল হলুদ রঙের ঝিঙাফুলগুলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায় রোজ। এর আর অনিয়ম হয় না কখনো।

দিদিমার নিজের জিনিস বলে কিছু নেই সংসারে শুধু একটি ছোট্ট স্টিল ট্রাঙ্ক ছাড়া। বহু পুরাতন ট্রাঙ্ক, সারা গায়ে মরচে ধরা; এই ট্রাঙ্কটিই একমাত্র দিদিমার নিজস্ব বস্তু। কাউকে ধরতে বা খুলতে দেন না এটা, 'তাক'-এ তোলা থাকে। মন যখন চায় নিজেই নামিয়ে আনেন, খোলেন, আবার তুলে রাখেন। দিদিমার কোমরের 'ঘুন্সি'তে চাবি বাঁধা আছে একটি, এই চাবি দিয়েই ট্রাঙ্কটা খোলেন নিরালা দুপুর দেখে। এর ভিতরে কী আছে দেখবার জন্য অনেকেই উৎসুক থাকে; কিন্তু দিদিমা সে সুযোগ দেন না কাউকে।

আমি দিদিমার আদরের নাতনী, সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকি; ট্রাঙ্কটা খুললেই তার উপরে উপুড় হয়ে পড়ি।

সংসার-খরচের টাকাপয়সা রাখেন দিদিমা একটা কালো মাটির ঘড়ায়; সে ঘড়া ঝোলে বেড়ার ধারে পাটের শিকায়। ট্রাঙ্কে আছে খান-তিনেক সাদা থান ধুতি, একটা ন্যাকড়ার মোড়কে গিঁট দিয়ে বাঁধা কয়েকটা ছোটো এলাচি, লাউ কুমড়ো ঝিঙে বরবটির বীজ একমুঠো, একটা যমজ সুপারি, এক টুকরো গঙ্গা মৃত্তিকা, একটা বেতের 'টুরি'তে কয়েকটা ঘিয়াকড়ি, একটা ছোট্ট আয়না ইঞ্চি চারেক লম্বা— কবে কোন্ মেলা থেকে কেনা, কোমরের ঘুন্সি একগাছা, একটা গিলে, কাঁচের একটা পেটমোটা খালি বোতল, হরেকৃষ্ণ নামছাপা নামাবলী একখানা; আর কাশীর কাঠের সিঁদুরের কৌটাতে দিদিমার সাতনরী হারের লকেটের একটি সোনার 'তেঁতুলপাতা'। এই হল দিদিমার একান্তভাবে আপন সম্পত্তি।

কাজ ছাড়া দিদিমা থাকতে পারেন না। যেন কাজই সংসার, সংসারই কাজ। সারাদিন এটা ওটা কাজ নিয়ে ব্যাপৃত থাকেন।

গ্রাম-দেশের নিয়ম— পুত্রবধূ ঘরে এলে শাশুড়ি ননদ ছুটি নেয়। সকল কাজ বউ করে। দিদিমার তখন ছয় ছয় পুত্রবধূ ঘরে; দিদিমা রোজ বিহানবেলা কাক না ডাকতে ওঠেন, উঠে উঠোনে 'গোবরছড়া' দেন, গোয়াল ঘর থেকে গোরু বের করে বাইরের দিকে নিয়ে খুঁটি পুঁতে চরতে ছাড়েন, পুকুরঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢোকেন— বাড়ির সবাই জাগে তখন।

উঠোন ভরে ধান রোদে দেওয়া হয়েছে, সকল কাজের ফাঁকে ফাঁকে দিদিমা নিজে এসে রোদের তাতে গরম হয়ে ওঠা ধানের উপরে পায়ে পা ঠেকিয়ে চলে চলে উলটে দেন সে ধান। ছাতু কোটা হয় ঢেঁকিশালে, দিদিমা কুলোর তলায় দুহাতের আঙুলগুলি টুক্‌টুক্ করে ঠুকে ছাতু টোকেন। বড়ো দানাগুলি পড়ে যায়

মাটিতে, মিহি ছাতু লেগে থাকে কুলোর বুকে। দিদিমার মতো মিহি ছাতু টুক্‌তে কেউ পারে না এ গ্রামে।

পাট দিয়ে শিকা বানান দিদিমা। খামের গায়ে পাটের গোছা বেঁধে পাশে রাখা জলের বাটিতে আঙুল ভিজিয়ে সরু সরু মোলায়েম মিহি বিনুনি করেন শিকা'র।

চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো আমাদের নিত্যকার ওঠা চুল দিয়ে দিদিমা 'গুছি' বানান অবসর সময়ে বসে। সেই গুছি দিয়ে বড়ো করে 'গিলে খোঁপা' বেঁধে দেন আমাদের মাথায়।

সামান্যতম জিনিসেও অনাদর অবহেলা নেই দিদিমার। ফেলে-দেওয়া নারকেল মালাটা, দড়ির টুকরোটা, ভাঙা ঝিনুকটা— তুলে রেখে দেন চালের বাতায়। বলেন, 'ফেলতে নেই কিছু। যারে রাখো সেই রাখে'। একদিন হয়তো এইটুকু জিনিসের জন্যই ঠেকে যেতে হবে। বলা কি যায় কিছু'?

দাদামশায়কে মনে নেই, আমাদের দু বোনের অতি ছোটোবেলায় মারা গেছেন তিনি। দিদিমাকে জানি। দিদিমার নাম রাজলক্ষ্মী। দূর গ্রামে পিত্রালয়। বাপ মা বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দু-দুবার কলেরায় সে গ্রাম খালি। রক্তের সম্পর্ক বলতে তেমন আর কেউ নেই বেঁচে তাঁর— শুধু এক বৃদ্ধ খুড়া ছাড়া।

নিঃসন্তান সেই খুড়া একদিন তাঁর অতি বৃদ্ধা স্ত্রীকে নিয়ে চলে এলেন রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়ে। মরণকালে নাতিদের হাতে জল পাবেন— এই আকাঙ্ক্ষা।

মামারা পুবের ভিটায় ঘর-লাগা চালাঘর তুলে দিলেন একখানা। বুড়োবুড়ি সেখানে সংসার পাতলেন। জামাই বেঁচে না থাকলেও জামাইয়েরই তো বাড়ি? জামাইয়ের ভাত খাবেন কি করে? সে অভিমানটা আছে মনে।

টক্‌টকে দুই বুড়োবুড়ি— যেন এক বোঁটায় সিঁদুর-পাকা ফল দুটি।

কিছুকাল বাদে বুড়ো মারা গেলেন। বুড়ি একা পড়লেন। বয়সের ভারে কোমর ভাঙা বুড়ির, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। উপুড় হয়ে চলেন। ভাঙা কোমরে এইরকম উপুড় হয়ে বুড়ি তুর্‌তুর্‌, তুর্‌তুর্‌— সারাদিন বাড়ি বাগান ঘুরে বেড়ান। হাতে থাকে ভারী একটা কাঁসার ঘটি। সেটা নিয়ে দিনে কতবার পুকুরঘাটে নামেন ওঠেন, প্রতিবার জল ভরে নিয়ে আসেন। আমের দিনে বনে বাগানে ঘুরঘুর করেন, কাকে ঠুক্‌রে একটা আম তলায় ফেলল কি তাড়াতাড়ি তুলে ঘটিতে রাখেন। মামীদের দেওয়া গোটা আম মনে ধরে না বুড়ির। বলেন, 'কাকে খাওয়া আম বেশি মিষ্টি। পাখিরা তো বুঝেই ঠোকর মারে ফলে।'

বুড়ি তো বুড়িই— কোমরে নেই জোর, মুখে নেই দাঁত, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ— তবু হার মানবেন না। নিজের হাতে রান্না করে খান রোজ। তাঁর ঘরেরই একটা কোণে কাঠের উনুন পাতা। চালের চেয়ে খুদই তিনি বেশি পছন্দ করেন। একটা পিতলের বোখ্‌নায় খুদের মধ্যেই টেঁড়স বেগুন সব একসঙ্গে সিদ্ধ করে একটা ঘ্যাঁট পাকান। সেই ঘ্যাঁট পাথরের থালায় ঢেলে নিয়ে খান। খেয়ে এক হাতে থালা আর-এক হাতে বোখ্‌নাটা নিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হাঁটতে পুকুরঘাটে গিয়ে থালা বোখ্‌না মেজে হাতমুখ ধুয়ে ঘরে উঠে আসেন। পুরো স্বাবলম্বী বুড়ি।

আমের দিনে শাকসবজিটুকুও লাগে না বুড়ির। আম দিয়ে খুদের 'জাউ' রান্না করেন। খুদটা বোখ্‌নায় ফুটতে থাকে, তাতেই ঐ কাকে-খাওয়া আম কয়েকটা খোসা ছাড়িয়ে ফেলে দেন, একটু নুন দেন, এক দলা গুড়ও দেন। আমে খুদে গুড়ে নুনে মিলে থক্‌থকে একটা হল্‌দেটে রঙের পদার্থ হয়। এই পদার্থটুকুর জন্য লোভ হয় আমার। বুড়ি খেতে বসেন আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। বুড়ি ডেকে আমাকে কাছে বসান, খেতে খেতে আমার হাতেও তুলে দেন কিছুটা করে। অমৃত লাগে মুখে।

দিদি খায় না, ওর বড়ো বেশি ঘেন্না, বলে, 'খেতে খেতে বুড়ির মুখ থেকে পাতে পড়ে কত। তুই-ই খা।'

এই বুড়ি একদিন মারা গেলেন। মরণে যে এত উৎসব— এই দেখলাম এদিন।

উঠোন ভরে গেল লোকে লোকে। বুড়ির নাতিরা— মানে মামারা— মামাদের সকল সমবয়সীরা সবাই খালি গায়ে কোমরে এক-একখানি লাল গামছা জড়িয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। জোয়ান জোয়ান নাতির দল সব— তাঁরা বাঁশ কাটলেন, আমগাছ কাটলেন। — আমকাঠ জ্বলে ভালো কাঁচা কালেও।

বুড়ির দেহ এনে শোয়ানো হল উঠোনে উত্তর-শিয়রী করে। এতকালের কোমরভাঙা বুড়ি এবারে পিঠ টান করে শুলেন বাঁশের শয্যার উপরে।

মা-মামীরা তিলকমাটি দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে কৃষ্ণ-পদছাপ এঁকে দিলেন। পায়ের তলায় শ্বেত চন্দন লেপলেন। মুদিত দুই চোখের উপরে দুটি তুলসীপত্র রাখলেন।

খোল করতাল হরিধ্বনি সংকীর্তনের ঝম্‌ঝমানির মাঝে নামাবলী-ঢাকা বুড়িকে কাঁধে তুলে পথে খই ছিটিয়ে হৈ হৈ করে চললেন মামার দল শ্মশানঘাটে। যেন চতুর্দোলায় বিগ্রহ বসিয়ে নিয়ে চললেন সকলে।

গাঁয়ের সবাই বললেন— হ্যাঁ, মৃত্যু বটে। যেমন এসেছিল বড়োমুখ করে নাতিদের কাছে, তেমনি মুখ রাখল 'ঈশ্বরে'।

দিদিমা শুধু চুপ করে বসে রইলেন আগাগোড়া উঠোনের এক কোণে সবচেয়ে ছোটো নাতিটিকে কোলে নিয়ে।

৭

বুড়ি ছিল, বুড়ি গেল। নিত্যকার সংসার যেমন চলে তেমনিই চলতে লাগল। কেবল বুড়ির ঘরটা অসম্ভব ফাঁকা ঠেকতে লাগল। দূর থেকে ঘরটার দিকে তাকাই, কাছে যেতে সাহস হয় না।

দিদিমার বাপের বাড়ির সম্পর্কে আপনজন শুধু আর-একজন রইলেন বেঁচে।— দিদিমার ভ্রাতৃবধূ— এ গ্রামের 'নয়াবাড়ি'র মহেশ্বরী ঠাকুরানী। এই একই দাদা ছিলেন দিদিমার, অল্প বয়সে মারা যান। স্বামী যেতে বিধবা মহেশ্বরী ঠাকুরনও চলে আসেন এ গ্রামে, আর ফিরে যান নি শ্বশুরালয়ে। 'নয়াবাড়ি' তাঁর বাপের বাড়ি।

নয়াবাড়ি না পুবপাড়ায়, না পশ্চিমপাড়ায়। একটু ছিটকে বেরিয়ে পড়া যেন। সিঙ্গিবাড়ির পরে আর-একটা খালশুকনো পথ। পথের ওধারে নয়াবাড়ি। কী করে যে ও-বাড়ির নাম নয়াবাড়ি হল জানি না। জানবার কথা মনেও পড়ে নি। বোধ হয় গ্রামের অন্যদের বাসবসতির অনেক পরে এ তল্লাটে এ-বাড়ি হয়— হবার সময়ে নয়াবাড়ি বলে উল্লেখ করতে করতে এই নামই শেষে থেকে যায়। গ্রামে আর সকলের বাড়ি— বাড়ির কর্তার পদবী দিয়ে। যেমন বোসের বাড়ি, ঘোষের বাড়ি, মিত্তির বাড়ি, চৌধুরী বাড়ি; কেবল পুবের বাড়ি আর নয়াবাড়ি এর ব্যতিক্রম।

নয়াবাড়ি তো নয়াবাড়িই। সব যেন নতুন জলুসে ভরা। ঘর, ঘরের চাল, রেলিঙ-ঘেরা বারান্দা— সবই যেন নতুন। কিছুতে ভাঙন ধরে নি, পুরাতনের ছাপ পড়ে নি।

নয়াবাড়ির মেয়েরা সকলেই সুন্দরী। একদল বিধবা নারী, প্রৌঢ়া, যুবতী নানা বয়সের, এঁরাই থাকেন বারোমাস এখানে। পুরুষেরা থাকেন নিজ নিজ সংসার নিয়ে কলকাতায়। মাঝে মাঝে বউদের নিয়ে পুজোর সময়ে আসেন দেশের বাড়িতে। পুরুষদের গিলেকরা পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। বউদের ফরাসডাঙা শাড়ি, হাতভরা সোনার চুড়ি, গলায় ঝলমল্লে নেকলেস; হাসি কাকলি— যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা খুলে পড়ে যায় দিনকয়েকের জন্য নয়াবাড়ির আঙিনায়।

এ বাড়ির সবচেয়ে যিনি রূপবতী, তিনিই মহেশ্বরী ঠাকরুন। বিয়ে হয়েছিল সে কতকাল আগের কথা, সে-সব প্রসঙ্গ ভুলেও গেছেন হয়তো, কিন্তু দিদিমার

সঙ্গে সম্পর্কটুকু আঁকড়ে আছেন এখনো। ননদ ভাজে খুব ভাব। আগুনে-সেঁকা তামাকপাতার টুকরোটা বাঁ হাতের তেলোয় করে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে গুঁড়ো করতে করতে দিনের মধ্যে কতবার এসে মহেশ্বরী ঠাকরুন ডাক দেন দিদিমাকে— 'আগো—অ ঠাকুরকন্যা'। দিদিমাও হাতের কাজ ফেলে এগিয়ে আসেন— বলেন 'কি কও গো বোঠাইন?'

বালবিধবা নিঃসন্তান প্রৌঢ়া, গ্রামদেশের কঠিন আচার-নিয়মে কাটালো কাল; তবু কী রূপ এখনো তাঁর! লম্বা ছিপছিপে দেহ, চলে যেন বিদ্যুৎলতাটি।

মহেশ্বরী ঠাকরুনের ভাইয়েরা রেঙ্গুনে কাঠের ব্যবসা করে বহু টাকার মালিক এখন। কলকাতায় জমি বাড়ি করেছেন, ছেলেদের উচ্চশিক্ষা দিয়েছেন; আবার দেশের বাড়ির প্রতিও মমতা রেখেছেন। বিধবা বোনরা, বোনদের বিধবা মেয়েরা, তারা সকলে দেশের বাড়ি আগলে থাকেন; ভাইয়েরা খরচ জোগান।

এর মধ্যে একদিন— স্ত্রী মারা যেতে পুত্র-পুত্রবধূদের হাতে কলকাতার সংসার ছেড়ে দিয়ে মহেশ্বরী ঠাকরুনের ছোটো ভাই প্রৌঢ় নিশিকান্ত দে চলে এলেন দেশের বাড়িতে বোনদের কাছে থাকতে।

এমনিতেই তো নয়াবাড়ির সকলেরই রূপে একটা আভিজাত্য ছিল। ইনি আসাতে যেন গ্রামের রূপ খুলে গেল।

সুপুরুষ শৌখিন ভদ্রলোক, নিশিকান্ত দে। বিকেল হলেই কোঁচানো ধুতি পাঞ্জাবি পরে শাল জড়িয়ে ছড়ি হাতে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসেন। একমাত্র এঁকেই দেখি মাকে পুরো নাম ধরে ডাকতে। বলেন— 'পূর্ণশশী, তুমি এলে তোমার সঙ্গে কথা বলে আরাম পাই। গ্রামে মন খুলে কথা বলবার মতো কে আছে বল?'

মা'র নিশিমামা এলে অনেকক্ষণ থাকেন। একটা বেতের চেয়ারে উঠোনের ধারের আমগাছটার তলায় অনেক সময়ে একলাই বসে থাকেন।

নয়াবাড়িতে তিনটে উঠোন। এ পথ দিয়ে গেলে প্রথম রান্নাবাড়ির উঠোন, পরে বাড়ির আসল আঙিনা, এ আঙিনা পেরিয়ে দক্ষিণে বাইরের দিকে প্রকাণ্ড একটি প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে নয়াবাড়ির লক্ষ্মীমণ্ডপ। চৌকো উঁচু মস্ত একখানা অতি সুন্দর ঘর, তিন দিক খোলা লোহার রেলিঙ-ঘেরা। প্রতি বছর লক্ষ্মীপুজো হয় এখানে।

দুর্গা প্রতিমার মতো চালচিত্র দিয়ে বড়ো করে লক্ষ্মীমূর্তি বানিয়ে বহু ধুমধামে পুজো হয় কোজাগরী পূর্ণিমাতে। ঢাক ঢোল সানাই কাঁসর— গোটা গ্রাম গম্‌গম্‌ করে।

দুর্গা প্রতিমা যেমন দশমীর দিনই জলে বিসর্জন দিয়ে দেয়, লক্ষ্মী প্রতিমাকে এঁরা সেরকম বিসর্জন দেন না। পুজো হয়ে গেলে প্রতিমা রেখে দেন মণ্ডপেই। বারোমাস থাকে। পরের বছর আবার নতুন প্রতিমা গড়বার সময় এলে এক বছরের পুরাতন মলিন মূর্তিটি তখন জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়।

লক্ষ্মীমণ্ডপ পেরিয়ে হারান বোসের বাড়িতে যাবার পথ। দিনে দুপুরে একা বা দিদির সঙ্গে এই মণ্ডপ পেরিয়ে যাওয়া ছিল এক মহা আতঙ্কের ব্যাপার। জনমানবহীন নির্জন এই এলাকায় মণ্ডপের ভিতরে লক্ষ্মীমূর্তির পায়ের কাছের বিরাট সাদা রঙের পেঁচাটা বড়ো বড়ো গোল গোল চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকে সারাক্ষণ। দেখে বুক দুরুদুরু করে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দম বন্ধ করে পেঁচাটার দিকে তাকাতে তাকাতে এক নিশ্বাসে ছুটে মণ্ডপটা পার হয়ে যাই। হারান বোসদের উঠোনে গিয়ে পড়ি।

এঁরা মামাদের জ্ঞাতি ঘর। আপদে-বিপদে সকলের আগে এসে পাশে দাঁড়ানোর সম্পর্ক এ ঘরে।

মা'র হারান খুড়া আমুদে মানুষ। মাথাভরা টাক, প্রচুর টাকা; কিন্তু অত্যন্ত হিসাবী ব্যক্তি। মামলা-মকদ্দমায় মাথা খুব। গ্রামের অনেকের অনেক মামলার ভার নিয়ে ইনি সদরে যাতায়াত করেন; করতে ভালোবাসেন।

হারান খুড়ার স্ত্রী লম্বা-চওড়া মহিলা, হালকা কয়েকগাছি চুল মাথার উপরে ঝুঁটি বাঁধা। পোড়া তামাকপাতার গুঁড়ো দাঁতে ঘষেন সর্বদা, দাঁত ঠোঁট কালো হয়ে থাকে তাই তাঁর।

হারান খুড়ার টাকার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে চার দিকে মুখে মুখে। তিনি যতই বলেন না কেন যে, সত্যি সত্যিই তাঁর কিছু নেই; কিন্তু মনে মনে মহা ভাবনায় পড়েন। নিরাপদ স্থান চাই একটা টাকাপয়সা রাখতে। ভেবে ভেবে তিনি একটা উপায় বের করলেন। শোবার ঘরের ভিতরেই আর-একটা ঘর বানালেন— আগাগোড়া টিন দিয়ে পাকাপোক্ত করে। চোরে সিঁদ কাটতে পারবে না, বেড়া কাটতে পারবে না, আগুন লাগলেও পুড়ে ছাই হবে না ঘর।

চালের মটকি, বাসনের সিন্দুক, কাপড়ের তোরঙ্গ, গহনাপত্র, টাকাকড়ি সব-কিছু নিয়ে খুড়ি ঢুকলেন সে ঘরে। রাত্রে দরজা বন্ধ করে একা নিজে ঘুমোন তার ভিতরে। স্বামীপুত্র থাকেন আগের শোবার ঘরে— টিনের ঘরের বাইরে।

একদিন হারান খুড়ো গেছেন সদরে। খুড়ি আর ছেলে আছেন বাড়িতে।— এই একটিই মাত্র পুত্র তাঁদের। সর্বকনিষ্ঠ সন্তান— কিশোর বালক। মেয়েরা সবাই

বিবাহিত, তারা পরের ঘরে। —রাত্রে খুড়ি যথারীতি শুয়েছেন ঘরের ভিতরের ঘরে দরজা বন্ধ করে, ছেলে আছে আগের শোবার ঘরের পালঙ্কে শুয়ে। মাঝরাত্রে চোর এসে সিঁদ কেটে ঢুকল শোবার ঘরে। বেশ জনকয়েক চোরই এসেছিল একসঙ্গে। ঘরে ঢুকে সেই টিনের ঘরের দরজায় ধাক্কাধাক্কি— ধম্‌কা ধম্‌কি,— 'খোল্‌, দরজা খোল্‌ শিগগির—'।

চোররা যত হুংকার ছাড়ে দরজা খুলে দেবার জন্য, খুড়ি ততই ভিতর হতে দরজার হুড়কো চেপে ধরে চীৎকার করেন— 'ওরে— তোরা কে আছিস আয় রে— চোর রে— ডাকাত রে—আমাকে মেরে ফেলল রে—'!

চীৎকার শুনে পাড়া-প্রতিবেশী লাঠিসোঁটা যা হাতের কাছে পেল নিয়ে বেরিয়ে এল। চোরের দল পালিয়ে গেল।

যুইত্যা— ছেলের নাম জ্যোতিপ্রকাশ— সে চোরদের দেখে চাদর মুড়ি দিয়ে কাঠ হয়ে পড়েছিল বিছানায়। চোররা তার খাটের পাশেই দাঁড়িয়েছিল কয়জনা।

পরদিন মা-মামীরা বলাবলি করতে লাগলেন, 'ছোট্‌খুড়ির সাহস আছে প্রাণে। দরজা তো খুললেন না কিছুতেই!'

দিদিমা বললেন, 'ভগবান রক্ষা করেছেন। টাকার মায়া কি এতই বেশি? চোরেরা যদি বলত— দরজা না খুলিস তো এই তোর ছেলেকে কাটছি— তখন কী করত যুইত্যার মা?'

বোসের বাড়ির একই উঠোনে তিন শরিক। এক শরিক রেঙ্গুনে চালের ব্যবসা করেন। স্ত্রী নিয়ে দেশে এলেন, স্ত্রীর হাতে রেঙ্গুনে গড়া সরু সরু সোনার চুড়ি এক এক গোছা, গলায় সরু চেন। গ্রামের মেয়েরা গিন্নিরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দলে দলে সোনার চুড়ি হার দেখতে। এত মিহি এত জেল্লা ওঠানো সোনার কাজ হয় না দেশগ্রামে। এখানকার অলংকার ভারী ভারী মোটা মোটা, এক এক তাল সোনা দিয়ে গড়া। 'রেঙ্গুনের গয়না রেঙ্গুনের গয়না', সাড়া পড়ে গেল গ্রাম জুড়ে। হার, বালা, বাজু, চিক, অনন্ত, নারকেলফুল ছেড়ে এবারে মিহি গহনার ফ্যাশান ধরল মেয়েদের মনে।

আরো এক শরিক আছেন উঠোনের একপাশে— স্বর্গগত জ্ঞাতিভাই-এর এক বিধবা স্ত্রী যুবতী কন্যা কিরণকুমারীকে নিয়ে। কিরণী বড়ো হয়ে উঠেছে, জ্ঞাতিগুষ্টি সকলের ভাবনা। বিধবার সন্তান— টাকার নেই জোর— কী হবে উপায়! তার উপরে নাকি রূপ ছিল না কিরণীর; কপালটা উঁচু, মুখের 'হাঁ'টা বড়ো।

সেই বড়ো মুখে দাঁত বের করে হাসে কিরণী— আমার দেখতে ভালো লাগে। সবার সমালোচনা শুনে মনে দুঃখ পাই। কিরণীর মাথার চুলগুলি এত কোঁকড়ানো যে হাজার আঁচড়ালেও চেপে থাকে না, ঘাড়ে কপালে কানের উপরে কুঁকড়ে ওঠে। এও আমার ভালো লাগে।

এই কিরণীরও একদিন বিয়ে হয়ে গেল। গরিবের ঘর। বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে কিরণী বড়ো মুখে দাঁত বের করে হেসেছে। শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেও প্রথমেই দাঁত বের করে হাসলো একমুখ।

কিরণীকে বিয়ে দিয়ে কয়েক মাসের মধ্যে তার মা মারা গেলেন। সবাই বললেন, 'যাক, জামাইয়ের মুখ দেখে গেল, নিশ্চিন্ত হয়ে মরল। নয়তো কি হত মেয়েটার? কিরণী এ সময়ে শ্বশুরবাড়ি ছিল।

বোসের বাড়ির পুর্বদিকে ছোট্ট একটা ডাঙাতে আছেন মা'র শশধর জেঠা, জেঠী, দুই বুড়োবুড়ি। বুড়োকে বাইরে দেখি নি বড়ো। ঘরের ভিতরে ভিতর-জোড়া কাঠের পালঙ্কে গদির উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে বসে থাকেন সব সময়ে; আর লম্বা নলে গড়গড়া টানেন। জবুথুবু চেহারা, আঁধার-আঁধার ঘর, গুড়গুড় গুড়গুড় নলের শব্দ— একবার উঁকি মেরেই সরে আসি। কেমন যেন রহস্যময় লাগে ভিতরটা। গোটা বাড়িটাই কেমন একটা চুপচাপে ভরা। জেঠার বিধবা এক মেয়ে আর প্রায়-যুবতী এক নাতনী স্নেহবালা কেবল আছে সংসারে। বড়োসড়ো স্নেহদিদি আমাদের কাছ থেকে একটু তফাত হয়েই থাকেন। এ পথ দিয়ে চলবার কালে মুখ তুলে তাকাই। দেখি, ঢিবির উপরে স্নেহদিদি দাঁড়িয়ে আছেন; তার চিকনচাকন মুখখানায় সোনার দুটি 'কাশ্মিরী মাক্‌ড়ি' ঝোলে দুপাশে, বড়ো সুন্দর লাগে।

দক্ষিণ পাড়ায় আর নেই বাড়ি। এর পরে ধানক্ষেত পাটক্ষেত; ক্ষেতের ওধারে জেলেদের পাড়া।

৮

দিদিমার পরেই বড়ো মাসীমার স্থান এ সংসারে। আসলে অবশ্য মা-ই হলেন কর্ত্রী। মা বাপের বাড়িতে এলে মা'র ইচ্ছেয় চলে সব-কিছু। মা দুরে থাকলে মা'র মত নিয়ে চলে সংসার।

মা'র অমতে কিছু করতে দিদিমা আজও পারেন না।

দাদামশায়ের আদরের কন্যা মা। শুনেছি, দাদামশায় দাবা খেলতে বসতেন, খেলতে খেলতে রাত গভীর হত, সাত-আট বছরের মেয়ে বাপের কোলেই ঘুমিয়ে থাকত। খেলা সাঙ্গ হত— দাদামশায় জিতেছেন— মহাখুশি; কোলের মেয়েকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলেছেন— 'মাগো,— কি খাবে মা?'

মেয়ে চোখ কচ্‌লে বলেছে— 'রুই মাছের মাথার চোখ দুটো খাব'।

তখুনি পুকুরে জাল ফেলিয়ে রুই মাছ ধরা হল। বিছানা ছেড়ে দিদিমাকে উঠে রান্নাঘরে আসতে হল। সেই মাছ রান্না হল। পাকা রুই-এর গোটা মাথাটা এনে মেয়ের সামনে ধরা হল। মেয়ে মুড়ো থেকে চোখ দুটো খুঁটে খুঁটে খেল। দাদামশায়ের আহ্লাদ দেখে কে!

আবার কোনোদিন হয়তো মেয়ে বলেছে 'ছোটো ছোটো হাত বাড়িয়ে এত্তো বড়ো পানতোয়া খাব।'

সেই রাত্রে ময়রাকে উঠে পানতোয়া বানিয়ে দিতে হত— তবে দাদামশায়ের শান্তি।

দিদিমা তখনো কিছু বলতে পারতেন না মেয়েকে, এখনো নয়।

আট ভায়ের এক বোন মা। মা'র দাদা ছিলেন একজনই; আর সাতজন মা'র ছোটো।

এই দাদারই স্ত্রী— মা'র বড়ো বোঠান, আমাদের বড়ো মামীমা। বিয়ের চার দিনের দিন বড়ো মামা নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কারণ কেউ কিছু জানে না। দিকে দিকে কত খোঁজ করা হল, সন্ধান মিলল না। কেউ বলে— সাধু হয়ে গেছে, কেউ বলে— বর্মা চলে গেছে, কেউ বলে— জলে ডুবেছে, কেউ বলে— কলেরায় মরেছে।

এ-সব অনেক আগের কথা। দাদামশায়ের জীবিতকালের কথা।

দাদামশায়ের বড়ো পুত্রবধূ; শখ করে বউ এনে যেমন ঘরে তুলেছিলেন, স্নেহ মমতা ঢেলে তাকে তেমনি আড়াল করে রেখেছিলেন।

তার পর তিনিও চলে গেলেন।

এও কত কালের কথা।

বড়ো মামীমাকে সাজ বদলাতে দেন নি দাদামশায়। সধবার বেশেই রেখে দিয়েছিলেন। দাদামশায় দিদিমা দুজনেই আশায় ছিলেন, তাঁদের সাধুপুত্র ফিরে আসবে একদিন। দাদামশায় মারা যাবার পর বড়ো মামীমা রঙিন শাড়ি পরা ছেড়ে দিলেন, কালো পাড় দেওয়া সাদা জমির শাড়ি ধরলেন। সেই কালো পাড়ই বেশ

চওড়া দেখে কিনে দিতেন মামারা। দেওরদের এই আবদারটুকু স্নেহের সঙ্গেই মেনে নিলেন তিনি।

কালো পাড় শাড়ি পরনে, আর দু হাতে দুটি সাদা শাঁখা— এই ছিল বড়ো মামীমার সাজ— আমাদের দেখা।

মামারা সবাই বড়ো মামীমাকে ভক্তি করেন, মানেন। মা তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। বড়ো মামীমা বয়সে মা'র চেয়ে ছোটো যদিও।

বড়ো মামীমার পিত্রালয়ের অবস্থা ভালো। বাবা ডাক্তার, দু-দশখানা গ্রাম জুড়ে তাঁর খ্যাতি যশ। বাপ এসেছেন কতবার কন্যাকে নিয়ে যেতে নিজের কাছে রাখবেন। বড়ো মামীমা যান নি।

বাবার মৃত্যুর পরে ভাইয়েরা এসেছেন, বলেছেন— 'এখানে আর কেন আমাদের কাছেই থাকবে চলো।'

বড়ো মামীমা যান নি।

ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে যদি-বা গেছেন পিত্রালয়ে, দু-চারদিন থেকে চলে এসেছেন। বলেছেন— 'হাজার হোক আমার শ্বশুরের ভিটে, আমার সম্মানের স্থান।'

গ্রামের ধারে পাঠশালা ছিল একটি, সরকারি পাঠশালা। মামারাই উদ্যোগী হয়ে নিয়ে এলেন সেটা নিজেদের বাড়িতে, যে, 'বড়ো বোঠান থাকুন এই পাঠশালা নিয়ে। একটা-কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।'

উত্তরের ভিটার ঘরে পাঠশালা বসল। দুপুর হলেই গ্রামের গুড়ি গুড়ি ছেলেমেয়েরা কল্‌বল্ করতে করতে এসে ভিড় করে উঠোনে। বড়ো মামীমা এখনকার মতো এদের 'গুরুমা'। গুরুমা তখন খেতে বসেছেন নিরামিষ ঘরে, ভিতর থেকেই হাঁক পেড়ে আদেশ দেন পাঠশালা ঘরের ভিতরে যে যার জায়গায় চুপ করে গিয়ে বসতে।

বড়ো মামীমা খাবার পরে ঘাট থেকে আঁচিয়ে একটুকরো হরিতকী মুখে দিয়ে একটা সরু বেতের ছড়ি হাতে নিয়ে উত্তরের ভিটায় যান, পাঠশালায় ঢোকেন।

একটা চশমা ছিল দাদামশায়ের, এক দিককার স্টিলের ডাঁটটা ভেঙে গিয়েছিল কবে কি জানি। বড়ো মামীমা সুতো দিয়ে বেঁধে সেই চশমাটা এই সময়ে চোখে লাগান। এই চশমা দিয়ে তিনি নাকি ভালো দেখতে পান।

বিকেলে রোদ্দুর গড়িয়ে পড়া অবধি বড়ো মামীমার পাঠশালা চলে। পড়া লেখা শেষ করে সবাই উঠে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে একসঙ্গে সুর করে নামতা পড়ে—এক অক্ষে এক, দুই অক্ষে দুই, তিন অক্ষে তিন... নয় দশং নব্বুই,

দশ দশং একশো। দুম্ করে একটানা একটা দম শেষ হয়। পাঠশালা ছুটি। হুড়হুড় করে সবাই বই-শ্লেট বগলে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে।

গ্রামের দু-তিন বছরের শিশুদের নামও লেখা থাকে বড়ো মামীর পাঠশালার নাম ডাকের খাতায়। 'উপস্থিত' 'অনুপস্থিত'— বড়ো মামীমা তাঁর অবসর সময়ে লিখে রাখেন মাসে দু-চার সন্ধ্যায় বসে।

যতজন ছাত্রছাত্রী আসে, তার চেয়েও সংখ্যায় বেশি আসে না যারা। তাতে অসুবিধা নেই কোনো। খাতায় সকলের নামের পাশেই লেখা থাকে 'উ'— মানে উপস্থিত। মামারা বড়ো বোঠানকে ঘিরে বসেন, হাসেন। বড়ো মামীমাও সে হাসিতে যোগ দেন। তার পর তিন-চারটে নামের পাশে অনুপস্থিতের 'অ' লিখে খাতা বন্ধ করেন।

গুরুমার বেতন মাসে একটাকা বারো আনা। তিন মাসের বেতন একসঙ্গে আসে মনিঅর্ডার যোগে।

সে বছর গ্রামে দু-তিনটে বিয়ে হল; নাইওরি ঝিওরি অনেক এল— সঙ্গে তাদের মেলা বাচ্চা-কাচ্চা। ঠিক সেই সময়ে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এলেন পরিদর্শনে। বড়ো মামীমার পাঠশালা নিয়ে মামাদের ছিল এক মজা। মামারা যেখানে যত পেলেন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সব কটা ছেলেমেয়েকে ধরে এনে বসিয়ে দিলেন পাঠশালায়। ইন্‌স্পেক্টর খুশি হয়ে গেলেন পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে দেখে। গুরুমার মাইনে আট-আনা বাড়িয়ে দিয়ে করে দিলেন দুটাকা চার আনা।

বড়ো মামীমা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে ডেকে হরির লুট দিলেন।

এই মাইনের টাকায় বড়ো মামীমা বড়ো লোক। ছোটো দুই দেওর প্রায়ই ভুলিয়ে-ভালিয়ে টাকা আদায় করেন তাঁর কাছ হতে। বড়ো মামীমা 'শনির পূজা' 'নারায়ণ সেবা' দেন এই টাকায়। বছরে একবার করে তাঁর গুরুদেব যখন আসেন বড়ো মামীমা নানা উপচারে ভোগ দেন, যাবার কালে গুরুদক্ষিণা দেন এই টাকা থেকে। জা'দের লাল পেড়ে শাড়ি দিয়ে 'সাধ' দেন। আমাদের পিঠে-পরমান্ন খাওয়ান। কী না করেন বড়ো মামীমা নিজের টাকায়।

দেওর-জা'দের নিয়ে সদাসন্তুষ্ট বড়ো মামীমা হাসিমুখে দিন কাটান।

মামারা সকলেই তাঁর দেওর। এই দেওররা সুযোগ পেলেই বড়ো মামীমাকে নিয়ে নানা তামাশা করেন। এ যেন তাঁদের একটা খেলা, একটা কৌতুক।

বর্ষার কাল, চারি দিকে ভরা জল। সাপ ব্যাঙ যত কিছু এসে কত সময়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে আশ্রয়ের আশায়। একদিন এক বিরাট জলঢোঁড়া এসে

খাটের নীচে 'বিড়ে' পাকিয়ে আছে; নজরে পড়ল দুদুমামার। খাটের নীচে থাকে রোজকার রান্না-খাওয়ার ধোয়া মাজা বাসন উপুড় করা। রান্নাঘরে রাখা হয় না বাসন চুরি হয়ে যাবার ভয়ে। প্রয়োজনমতো মামীরা থালা গামলা বের করে নেন, কাজের শেষে ধুয়ে মেজে আবার এনে যথাস্থানে রেখে দেন।

আমিষ নিরামিষ ঘরের বাসন আলাদা। পাথরের বাসনই বেশি ব্যবহার হয় নিরামিষ ঘরে।

দুদুমামা নিরামিষ ঘরের একখানা পাথরের বড়ো 'খাদা' দিয়ে সেই সাপটা ঢাকা দিয়ে রাখলেন। বড়ো মামীমা রান্না করছিলেন নিরামিষ ঘরে, টকের ডাল ঢালবেন— ব্যস্ত ভাবেই এলেন; এসে 'খাদা' ধরে টান দিয়ে সাত হাত ছিটকে পড়লেন। পরে অবশ্য দুদুমামাই সাপটাকে তাড়ালেন ঘর থেকে। পানের ডিবায় গেছো ব্যাঙ ধরে বড়ো বোঠানকে পান খেতে দেওয়া— এ তো ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

আমরা প্রায়ই বড়ো মামীমাকে ঘিরে বসি, তিনি আমাদের পুরাণের গল্প বলেন। অনেক নীতিকথা শোনান। বড়ো মামীমার নিজস্ব নীতিও আছে কতকগুলি। বলেন—'দুষ্টকে বড়ো পিঁড়ি'। যে দুষ্টলোক তাকে বড়ো পিড়িখানা আগে এগিয়ে দেবে, তোয়াজ করবে। দুষ্টকে তুষ্ট রাখো, তাকে রুষ্ট করলে সে আরো বেশি করে অনিষ্ট করবে।

বড়োমামাকে নিয়ে একটা বড়ো বিস্ময় জাগে মনে। তাঁকে তো বড়ো মামীমা শুভদৃষ্টির সময়ে সেই যা একটু দেখেছিলেন কি দেখেনও নি; ছোট্ট বালিকা— ভয়ে সংকোচে জড়োসড়ো, মনেও নেই হয়তো স্বামীর মুখ। তবু সেই স্বামীর বাড়ির উপর কী টান বড়ো মামীমার!

একদিন বলে ফেলি, "আচ্ছা বড়ো মামীমা, সবাই তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে— জন্মে জন্মে যেন এমন স্বামীই পাই, এই-ই নাকি সতী স্ত্রীর লক্ষণ? তা তুমিও কি তাই কর?"

বড়ো মামীমা আঁতকে উঠলেন, বললেন, "বাপ্‌রে, এ জন্মে এই স্বামী নিয়ে যা ভুগলাম, আর বলি না যে এমন স্বামীই চাই।"

"তা তবে কি রকম স্বামী চাও?"

বড়ো মামীমা কী উত্তর দেবেন? চার দিকে তাকান।

আমিও ছাড়ি না।

বেড়ার গায়ে আঠা দিয়ে আট্‌কানো আছে অনেকগুলি ছবি, 'মাসিক প্রবাসী'· 'বসুমতী' থেকে ছেঁড়া। গান্ধীজী, তাজমহল, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাথায় বিড়ে পাগড়ি বসানো বঙ্কিমচন্দ্র— আরো অনেক কিছুর ছবি।

'ঐ— ঐরকম' বলে বড়ো মামীমা আঙুল দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবিখানি দেখিয়ে হেসে ফেলেন।

৯

ঘোষের বাড়ির নীচ দিয়ে যে খাল তার নামই হয়ে গেছে 'ঘোষের বাড়ির খাল'।

পুবপাড়ার সোজা পথ এসে পড়েছে এই খালের জলে। খাল পেরিয়ে এ পথ উঠে গেছে ও পারে পশ্চিমপাড়ার ভিতরে। শুকনোর দিনেও হাঁটু জল, গোড়ালি জল থাকে খালে। এই জলটুকু লোকে হেঁটেই পারাপার করে। এই ঢালু পথটুকু পার হওয়া আমাদের পক্ষে বিষম ভীতির ব্যাপার।

খালের ও পারে পথের দুধারে ঘন বাঁশের ঝাড়। দু'দিক থেকে অনেকগুলি করে বাঁশের ডগা পথের ওপরে ঝুঁকে পড়ে অন্ধকার করে রেখেছে পথটা দিনের বেলাতেও। শুনেছি জলের ধারে এইরকম সব বাঁশঝাড়েই ভূত-পেত্নীর বাস। দিনে দুপুরে এ পথে চলতে ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করে।

মা-দিদিমার সঙ্গে যখন ও পথে চলি, চোখ বুজে তাঁদের আঁচল চেপে ধরে থাকি। আর মা-দিদিমাকে লুকিয়ে সঙ্গী-সাথি দু-চারজন যখন একসঙ্গে মিলে ও পাড়ায় যাই— এই খালের মুখে এসেই কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। বুক ঢিবঢিব করে। কিন্তু এসেছি যখন যেতেই হবে, সাহসে ভর করে হোঁচট খেতে খেতে চলি, চলতে চলতে ছুটি। তলায় ভিজে বাঁশপাতার মসৃণ গায়ে পা পিছলে যায়— হড়কে হড়কে পড়ি, পড়তে পড়তে উঠি। এই হাত-কয়েক পথ যেন শেষ হয় না কিছুতে। মনে হয় কতকাল ধরে যেন এইরকম হুমড়ি খেয়ে খেয়ে ছুটছি।

শেষে কোনোমতে পারের ওপর উঠে একপলক পিছন ফিরে তাকাই, তাকিয়েই প্রাণপণে দৌড়তে থাকি। পিঠের দিকের ভয়টা যেন দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে আসে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ি—

'ভূত আমার পুত
পেত্নী আমার ঝি,
রামলক্ষ্মণ কাছে আছে—
করবে আমার কি?
রাম— রাম— রাম রাম।'

দিদিমা শিখিয়ে দিয়েছেন মন্ত্র— ভয়ে আতঙ্কে আমাদের রক্ষাকবচ। বলেছেন— 'রাম নাম নিবি, রাম নামের কাছে ভূত প্রেত দানা দৈত্যি কেউ আসতে পারে না।'

পশ্চিম পাড়ায় পশ্চিমমুখী পথ। পাড়ার মুখে নমঃশূদ্র ভুঁইমালীদের কয়েকটা বাড়ি, আর গোপাল ধোপার বাড়ি। গোপাল ধোপী গ্রামের ধোপী; কুচ্‌কুচে কালো— দশাসই চেহারা, যেন ডাকাতটা। কিন্তু বড়ো বিনয়ী। সর্বদা নত দৃষ্টিতে কথা বলে গুরুজনদের সঙ্গে। গোপাল ধোপীর বউ ক্ষেমী ধোপানী মামীদের বয়সী। ঢলঢলে মুখে মিশিকালো দাঁত, রসিকা। বাড়ি বুঝে ক্ষেমী নিজে আসে, কাপড় দেয় নেয়। ময়লা কাপড় নিতে এসে মামাদের সঙ্গেও হেসে দুটো কথা না বলে যায় না। দেওর সম্পর্ক পাতায় পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে, বলে 'অমুক' আমার 'ঠাকুর পুত্‌রায়'— মানে শ্বশুরের পুত্র, দেওর।

গ্রামে কায়স্থ শূদ্র সকল ঘরেই বউরা শ্বশুরকে বলে 'ঠাকুর', শাশুড়িকে ঠাকুরানী— সংক্ষেপে 'ঠাক্‌রুন'।— আরো সংক্ষেপে 'ঠাইন'। ভাসুরকে বলে ভাসুরঠাকুর, ঠাকুরপো হন ঠাকুর পুত্‌রায়, আর স্বামীর বড়ো বোন— ননাস ঠাকুরানী, ছোটো বোন ঠাকুরকন্যা। শ্বশুরের সম্মানে সকলের সম্মান।

'ঠাকুর' ডাক শ্রেষ্ঠ সম্মানের ডাক। ছোটো ভাইবোনেরা ডাকে বড়ো ভাইকে— 'ঠাকুর ভাই'।

ক্ষেমী ধোপানীর বাড়ি পেরিয়ে পথের মোড়ে বহু পুরাতন একটা অশত্থ গাছ, অসংখ্য লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে। খরার দিনে পাশের গ্রাম থেকে হাট করে লোকে হাঁটাপথে ফেরে এই গাছতলা দিয়ে। রাত-বিরেতে নানা কিছু নাকি দেখে লোকে এইখানটাতে। কতবার কতজনে কাশির আওয়াজ শুনেছে। জগা ভুঁইমালী স্বচক্ষে দেখেছে, একটা সাদা শাড়ি ঝুলছে গাছের ডাল হতে। রাত্রিবেলা ফিরছিল একা, হাওয়ায় দুলছিল সেই লম্বা আঁচলটা। ভাগ্যিস লাগে নি গায়ে— তবে তো একটানে তুলে নিত তাকে গাছের ওপরে।

—কে নিত?

—কে আবার? পেত্নী!

এই অশত্থগাছের তলা দিয়ে কিছুটা উঠে সবার আগে পড়ে মা'র সুবাসী বইনের বাড়ি। অসম্ভব লম্বা এই সুবাসী বইন। তার সব-কিছুই লম্বা। মুখ লম্বা, হাত পা লম্বা; বসেন যখন— পিছন দিকে খোলা পিঠটার কাঁধ হতে কোমর অবধি মনে হয় একটা ছোটোখাটো মানুষ দাঁড়িয়ে যেন।

সুবাসী বইন থাকেন একটা চালাঘরে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে। কি করে যে তাঁর সংসার চলে— মা-মামীরা আক্ষেপ করেন। স্বামী কবি-গানের দলে গান গেয়ে ঘোরেন; কদাচিৎ বাড়িতে আসেন।

বড়ো মামীমার মুখে একটা ছড়া শুনি প্রায়ই; বলেন, 'যাত্রা দেখে ফাত্রা লোকে, কবি শোনে খবিশ লোকে'। অর্থাৎ যাত্রা ফাজিল-ফক্কর লোকরাই দেখে রাত জেগে। আর 'খবিশ'— বোধ হয় আরো নিকৃষ্ট কিছু হবে— কবিগান তারাই কেবল শোনে। যত কুৎসিত কথা, গালাগালি থাকে নাকি কবি গানে। ভদ্রলোকের স্থান নয় মোটে।

সুবাসী বইনের স্বামী কবিগানের লোক। শুনে মনে দুঃখ হয়, ভয়ও পাই। যদি কখনো আসেন আমাদের বাড়ি, ঘর থেকে বের হই না, বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে দেখি।

মা দাওয়ায় বসে বসে লেস বোনেন, নয় 'ছাঁচ' কাটেন, সুবাসী বইনের স্বামী পাশের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকেন। অত্যন্ত লাজুক নিরীহ প্রকৃতির মানুষ; মা'দের সঙ্গে কখনো সামনাসামনি মুখ তুলে কথা বলেন না।

এই মানুষই কবিগানের আসরে একেবারে অন্য লোক।

সুবাসী বইনের বাড়ির পর মজুমদারদের বাড়ি। সমৃদ্ধিশালী পরিবার। বাড়ির কর্তা মা'র জ্ঞাতিগুষ্টি সম্পর্কে ভগ্নিপতি। এই একটি 'জামাই' সম্পর্ক লোকেরই বাস এ গ্রামে। শৌখিন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি, সদরের উকিল। পাট করা ধুতি গিলে করা পাঞ্জাবি, কোঁচানো একটি চাদর গলার দু পাশ দিয়ে ঝোলানো, হাতে হাতির দাঁতের বাঁধানো একগাছি ছড়ি, পরিপাটি করে টেরিকাটা চুল— এ ছাড়া কখনো কেউ বাইরে দেখে না এঁকে। পায়ের জুতো জোড়া চিক্‌চিক্ করে, এমনিই তার পালিশ। পরে যখন কাজে অবসর নিয়ে গ্রামে এসে রইলেন— যখন জুতোয় তালি পড়তে লাকল, তখনো তাঁর দুপায়ের জুতোয় পালিশ ঝিলিক খেলে। মা বলেন— 'মজুমদার মশাইয়ের জুতো তো নয়, আয়না; মুখ দেখা যায়।'

মজুমদার মশায়ের প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছেন বহু আগে ছোটো ছোটো পুত্রকন্যা রেখে। দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন, সে স্ত্রীও মারা গেলেন। এই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মা চলে এলেন জামাতার কাছে, মৃত কন্যার স্মৃতি ধরে রাখতে। কন্যার সতীনের পুত্রকন্যাদের লালনপালনের ভার নিয়ে থেকে গেলেন সেই হতে এখানে।

এ অনেকদিনের আগের কথা। মজুমদার মশায়ের এই শাশুড়ি গ্রামের কার

কী সম্পর্কের জন সে খেয়াল করে না কেউ, ছোটোবড়ো সকলেরই তিনি মুরলাপিসি।

মুরলাপিসি চলেন বাতাসের আগে, এই দেখ এখানে— ঐ দেখ চলে গেছেন ঐ পাড়াতে।

থানধুতির আঁচলটা গায়ের উপর দিয়ে টেনে এনে গলায় জড়িয়ে ঢেকে রাখেন গলাটা। গলায় শ্বেত ছোপ কয়েকটা। কখনো একটু গলার কাপড় সরে গেছে, আমরা জিজ্ঞেস করেছি— 'কি হয়েছিল গলায়'? বলেছেন 'পুড়ে গিয়েছিল'। অবাক হয়ে ভাবি, মুখ না, বুক না, কেবলমাত্র গলাটা পোড়ে কি করে? মুরলাপিসি বলেন, 'শীতকালে মালসার আগুন নিয়ে শুয়েছিলাম রাত্রে, ঘুমের ঘোরে মালসার আগুন উল্টে পড়ল গলায়।'

বিস্ময় কাটে না তবু, মামীদের জিজ্ঞেস করি, তাঁরা ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেন।

মালসাভরা আগুন কাছে রাখা অবশ্যি অভ্যেস মুরলাপিসির। পুরো শীতকালটা পেটের কাছে আঁচলে ঢাকা তুষের আগুনের গরম মালসাটা ধরে নিয়ে পিসি তর্‌তর্‌ করে গ্রাম ঘুরে বেড়ান। আমাদের বাড়িতেই আসেন কতবার। আর-কারো বাড়িতে যদি পাত্রী দেখতে এল ভিন্‌ গাঁ থেকে পাত্রপক্ষের দল— ছুটে মুরলাপিসি যান সেখানে। আগুনের মালসাটা জুত্‌ করে দু পায়ের মাঝখানে নিয়ে আঁচল ঢাকা দিয়ে বসেন। তার পর গল্প জুড়ে দেন নতুন আসা অচেনা অতিথি দলের সঙ্গে।

গ্রামের ছেলেরা পিসিকে কয়েকটা ইংরেজি কথা শিখিয়েছে কৌতুক করে। যেমন— গুড্‌ ম্যান, ব্যাড ম্যান, মানি, পজিশন, ভেরি মাচ— ইত্যাদি। এই কথাগুলি মহা উৎসাহে অতি গর্বভরে পিসি বলেন এ-সব ক্ষেত্রে। বলেন, "আপনারা 'ব্যাড ম্যান' লোক হবেন না, 'গুড ম্যান' মানুষ হন। পণের 'মানি' অত বেশি 'ভেরি মাচ' চাইলে কি করে হবে? 'পজিশন' করে রেখে দেখে কথা বলবেন তো?"

মুরলাপিসির কথায় আর হাতমুখ নাড়ার ভঙ্গিতে পাত্রপক্ষরা মজা পান, হাসেন; পাত্রীপক্ষরাও হাসেন। দু পক্ষের জড়তা সংকোচ কেটে যায় অনেকখানি এই আবহাওয়ায়। আর গুড়ি গুড়ি দাঁত বের-করা মুরলাপিসির মুখের হাসিখানা হয় তখন একটা দেখবার মতো বস্তু। পিসির ধারণাই যে, তিনি না এসে পড়লে পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলাপ চালাবার কেউ-ই নেই এই গ্রামে।

মজুমদার বাড়ির সামনে দাসের বাড়ি। দাসরা এককালে দালান তুলেছিলেন; বড়ো করেই তুলেছিলেন; কিন্তু শেষ আর করেন নি। কেন করেন নি কি জানি? এতদিনে ইঁটের গাঁথুনি খুলে খুলে পড়ছে। শ্যাওলায় সবুজ হয়ে গেছে দেয়ালের গা।

মা-মামীরাও জানেন না, কেন দাসেরা তুলতে তুলতে তুললেন না দালান। একটা দুটো ঘর ছাড়া ঘরে ছাদ পর্যন্ত হয় নি ঢালাই।

গ্রামদেশে দালান তোলা এক দুরূহ ব্যাপার। সদর থেকে নৌকো করে আনাতে হয় ইঁট চুন সুরকি বালি লোহা-লক্কড় যাবতীয় কিছু। আনাতে হয় রাজমিস্ত্রির দল। অর্থ সময় দুইয়েরই প্রচুর প্রয়োজন। কোন্‌টাতে এঁরা আটকে গেলেন কি জানি!

দাসেরা সব থাকেন বিদেশে, বুড়ি এক ঠাকুরমা থাকেন এখানে। আর আছেন আশ্রিত আত্মীয় কয়েকজন।

যে ঘরে বুড়ি থাকেন সেই ঘরে আছে মস্ত একটা কাঠের সিন্দুক। এই সিন্দুক আগ্‌লে নিয়ে বুড়ি থাকেন সর্বক্ষণ। একা থাকেন সে ঘরে। সকলের ধারণা বুড়ির অনেক অলংকার টাকাকড়ি আছে সিন্দুকে।

একবার একদল ডাকাত এল রাত্রিকালে, বুড়ির গলা টিপে ধরলে; বলল, 'দে, সিন্দুকের চাবি দে। বল্‌ চাবি কোথায় আছে?'

বুড়ির কোমরের ঘুন্সিতে চাবি ছিল; কিছুতেই দিলেন না, বা বললেন না। ডাকাতরা যতই গলা টিপে ধরে, বুড়ি গঁ-গঁ করেন। বুড়ির সেই শব্দে বাড়ির লোকেরা জেগে উঠল। ডাকাতরা পালিয়ে গেল।

বেশ কয়েকদিন বুড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি, গলা ফুলে উঠেছিল।

দাসেদের বাড়ির সামনে মস্ত এক দিঘি। বাঁধানো ঘাট। খুব যত্ন নিয়ে কাটিয়েছিলেন এ দিঘি দাসেরা। সারা বছর জল টলটল থাকে দিঘিভরা।

মাঝে মাঝে মা-দিদিমার সঙ্গে আসি এ ঘাটে, স্নান করি— সাঁতার কাটি। গভীর জল, বেশি দূরে যাই না। দিদিমা বলেন — 'বড়ো বড়ো পুকুরে জলের নীচে 'শিকল' আছে, পায়ে আটকে টেনে নিয়ে যায় একেবারে জলের তলায়। বিশেষ করে নিরালা দুপুরবেলায়'। বলেন— কখনো যেন একা একা না আসি আমরা, বড়োদের ছাড়া।

সঙ্গীসাথিরা মিলে ঝাঁপাঝাঁপি করে পুকুরে স্নান করার খুব ঝোঁক আমাদের। সুবিধে পেলেই জলে নেমে পড়ি। এ নিয়ে দিদিমার সর্বক্ষণ একটা ভয় মনে।

দাসের বাড়ির পশ্চিমে মিত্তির-বাড়ি। মিত্তির বাড়িতে বহু শরিক। এ উঠোন ও উঠোন, উঠোনই কত। মস্ত গুষ্টি, ভাগ ভাগ, আলাদা।

এ বাড়ির সতীশ মিত্র গ্রামের একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি। 'খাঁটি সৎ' বলে এঁর প্রচার। গ্রামের লোকে লঘু গুরু নানা সমস্যা-সংকটে আসে এঁর কাছে উপদেশ পরামর্শ নিতে। এর ওর বাদ-বিসম্বাদ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মিটিয়ে দেন ইনি, মামলা-মকদ্দমা যতটা পারেন গড়াতে দেন না কোর্টকাছারি পর্যন্ত। কারো আপদে বিপদে এসে বুক পেতে দাঁড়ান। সমাজের কলঙ্ক কেলেঙ্কারি ক্ষমা দিয়ে শোধন করেন।

এঁরা স্বামী-স্ত্রী মন্ত্রদীক্ষা নিলেন। এই দিনে প্রতি বছর বাড়িতে তিনদিন অহোরাত্র কীর্তন করান। মহোৎসব হয়।

দূর দূর গ্রাম থেকে আসে লোক, আসে নারীপুরুষ সকলে। কীর্তন শোনে, খিচুড়ি লাব্‌ড়া প্রসাদ খায়। এ-উৎসবে জাতিভেদ নেই।

অসংখ্য লোক আসে।

এই তিনদিন— বড়ো বড়ো উনুনে দিবারাত্রি চাল-ডাল ফুটছে। ফুটছে আর হাঁড়ি-সমেত খিচুড়ি এনে উপুড় করে ঢালছে পাশে রাখা গাবের কষ দিয়ে মাজা খোলা নৌকোর খোলে। সিদ্ধ ডালে-চালে নৌকো ভরে উঠলে পর গরম তেলে-ঘিয়ে জিরে লঙ্কা তেজপাতা ভেজে কড়াই-ভরা ফোড়ন ঢেলে দিল নৌকোয়, দুই জোয়ান দুই বৈঠা নিয়ে দুদিক হতে ঘুঁটে দিল খিচুড়িটা। স্বাদে সোয়াদে তৈরি হয়ে গেল তা।

একদিকে এক নৌকো খালি হতে থাকে, আর দিকে অন্য নৌকো ভরে ওঠে গরম গরম খিচুড়িতে।

লাব্‌ড়াও তাই। নৌকো ছাড়া এত লাব্‌ড়া রাখবার ঠাঁই কোথায়? যাবতীয় তরকারি দিয়ে হয় এই লাব্‌ড়া।

অহোরাত্র যেমন বিরামহীন নামগান, এই প্রসাদ-বিতরণও তেমনি চলে দিবারাত্রি একটানা।

কারা যে রান্না করে, কারা যে পরিবেশন করে বুঝবার উপায় নেই। যে পারছে করছে, সকলেই করছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। মহা উৎসাহ এ পরিশ্রমে।

এই তিন দিন দিদিমার সঙ্গে এখানেই প্রায় সব সময় কাটাই। ঘুরে ঘুরে রান্না দেখি, কাটা তরকারির পাহাড় দেখি। ক্ষিদে পেলে সারির সঙ্গে বসে খাই; অপূর্ব এক স্বাদ এই খিচুড়ি লাব্‌ড়ার।

সন্ধেবেলা দিদিমার কোল ঘেঁষে বসে ঘুমঘুম চোখে কীর্তন শুনি।

এই কীর্তনের আসরেই একদিন দুই জেলে-ভাইকে প্রথম দেখি। কালো রঙের বলিষ্ঠ চেহারা, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো কালো চুলের বাব্‌রি, মুখে কালো মোটা গোঁফ; ঠিক ডাকাত-ডাকাত ভঙ্গি। দেখতে দুজনে হুবহু এক। কয়েক পলকের ছোটো বড়ো এই যমজ জোড়া। কে বড়ো কে ছোটো তা কেবল তারাই জানে শুধু।

এ সন্ধ্যায় আসরে দাঁড়িয়ে এই দুই ভাই গান গাইছে। এরা দুজন আজ মূল গায়েন। ঘুরে ফিরে গাইবার কালে একজনের পায়ে আর জনের পা লেগে গেল, সে তখুনি লুটিয়ে অন্য ভাইকে প্রণাম করল। প্রণাম যে নিল সে হল বড়ো ভাই। বড়ো ভাই ছোটো ভাই-এর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। গান গাইতে গাইতেই হয়ে গেল এটা, গান থামল না।

অতি মধুর গানের গলা দুই ভাই-এর। 'নিমাই সন্ন্যাস' গাইছে— নিমাই সংসার ছেড়েছেন, খুঁজতে খুঁজতে এসেছেন 'গুরুর' কাছে। শ্রীগুরুর চরণে নিবেদন করলেন অন্তরের আকাঙ্ক্ষা— মন্ত্র নেবেন।

গুরু আনন্দে উন্মাদ। নিমাইকে বুকে তুলে নিলেন— দু ভাই দু বাহু বাড়িয়ে দুজনে দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরে গেয়ে উঠল—

'ওরে, এমন শিষ্য কে না করে?
যেজন গুরুকে তরাইতে পারে।'

ফিরে ফিরে বিহ্বল হয়ে গাইতে লাগল লাইন দুটি। চোখে তাদের জল দেখে আমারও চোখ জলে ভরে উঠল। তাদের মতো আমারও দুগাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

মিত্তির-বাড়ির ডাইনে বাঁয়ে রায়-বাড়ি, দে-বাড়ি; গুহ-বাড়ি, দত্ত-বাড়ি। তার পরে পশ্চিম দিকে যে পথ, তা চলে গেছে পাশের গ্রামে। এ গ্রামে বাজার দোকান নেই। এ গ্রামের হাটবাজার সব হয় সেই গ্রামে।

১০

নন্দীদের বাড়ির সামনের পুকুরে বাঁধানো ঘাট, চওড়া সিঁড়ি নেমে গেছে জলে। ঘাটের উপরে বাঁধানো চত্বর ঘিরে বসবার বেদি— পিঠ ঠেস দেওয়া। এইখানে এসে বসে পাড়ার মুরুব্বি স্থানীয় নারী পুরুষেরা রোজ সকালে বিকালে— দু বেলা। গরমের দিনে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় মজলিশ ভাঙতে। দক্ষিণমুখী ঘাট, ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগে গায়ে, স্নিগ্ধ করে দেয় দেহ মন।

ঘাটে বসে পুকুর বরাবর দূরে দেখা যায় 'সিদ্ধেশ্বরীতলা'র প্রকাণ্ড অশত্থ গাছের কালো মাথাটা। এই পর্যন্ত গ্রামের দক্ষিণ সীমা। এর পরে টানের দিনে ধূ ধূ ক্ষেত; জলের দিনে চার কূল প্লাবিত জল। 'আরইল বিল' নাম এর। গ্রামের উন্মুক্ত দিক এটা।

ঘাটতলার উপরের পৈঠাতে তেল-সিঁদুরে মাখা 'সুবচনী'। ছোটো ছেলের মানুষ আঁকার মতো মূর্তি; একটা গোল আকার, এটা মাথা; মাথার দুপাশ দিয়ে উপর দিকে ঊর্ধ্ব বাহুর মতো দুই হাত, নীচের দিকে তেমনি দুদিকে দুই পা— যেন হাঁটু ভেঙে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা।

পৈঠার উপরে লাল রঙের পুতুলের মতো এইরকম তিনটি শোয়ানো মূর্তি। বছরের পর বছর ধরে তেল-সিঁদুর মাখাতে মাখাতে পুরু হয়ে উঠেছে মূর্তি তিনটি।

এই তিন মূর্তি হলেন— আকলি, সুমতি, ভগবতী; তিন বোন। একসঙ্গে 'সুবচনী'। সুখবর এনে দেন এঁরা গৃহস্থকে। স্বামী, সন্তান, বুকের জন, কাছের জন সব থাকে বিদেশে বিভুঁয়ে; সংসারে অসুখবিসুখ জ্বালাযন্ত্রণা অঘটন-দুর্ঘটন প্রতিনিয়ত। ঘরে ঘরে মা-মাসির বুক কাঁপে। খবর পত্র না পেলে দুশ্চিন্তায় মন ভরে ওঠে। অকূলের কূল— তখন মনে মনে মা সুবচনীকে ডাকে, কুশল খবর যেন এনে দেন মা।

সেই খবর যখন আসে তখন সর্বাগ্রে সুবচনীকে স্মরণ করতে ভুল হয় না কারো।

একটা পিতলের রেকাবিতে পান-সুপারি সিঁদুর, ছোটো একটা বাটিতে তেল, কিছু বাতাসা— এই-সব সাজিয়ে গৃহকর্ত্রী ঘাট্‌লায় চলে আসেন। এসে উলুধ্বনি দেন। ঘাট্‌লায় এই উলুধ্বনি পড়লেই সবাই বোঝে কোনো সুসংবাদ এসেছে কারো। ছুটে আসে সবাই। আসে সুসংবাদ শুনতে, আসে সুবচনী ব্রতকথায় যোগ দিতে। আমরা ছোটোরা আসি ব্রতকথা শেষে একখানা দুখানা বাতাসা পাব, সেই লোভে।

মানতকারিণী সুবচনীকে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে তিন জনকে তিনটি গোটা পান সুপারি বাতাসা দিয়ে ফুল দূর্বা হাতে নিয়ে সকলে ঘিরে বসেন। খালি হাতে শুনতে নাই ব্রতকথা। এঁদের মধ্যে যিনি ভালো করে বলতে পারেন তিনি 'কথা' শুরু করেন— 'এক যে দুইখ্যা— সে জন্মদুঃখী'— এই দুইখ্যার কাহিনী দিয়েই কথা শুরু হয়। জন্ম হতে পিতৃমাতৃহীন দুঃখী ছেলে অতি দুঃখে দিন কাটায়, বনে বনে ঘোরে, কচু-ঘেচু খায়। আকলি সুমতি ভগবতী তিন বোন, বনে হিজলতলায় বসে পাশাদাবা খেলেন। একদিন দুইখ্যা তিন বোনের দেখা পায়,

দয়া পায়। পেয়ে জগতে সুবচনীয় ব্রত চালু করে। 'কথা' শেষে বলেন— এই ব্রত করলে কি হয়? না— 'অকূলে পড়লে সুবচনী পারে তুইল্যা দেয়, যেই বর মাগে সেই বর পায়।'

আবার উলুধ্বনি পড়ে। ব্রত সমাপন হয়। ব্রতকারিণী সধবা বিধবা বালিকা বৃদ্ধা সবার মাথায় তেল ছোঁয়ান, হাতে পান-সুপারি দেন। সধবাদের কপালে সিঁদুর পরান; হাসিমুখে ঘরে ফেরেন।

সুবচনীর এই মাহাত্ম্য, গৃহস্থকে সুখবর এনে দেন একজনের সুখবরে পাঁচজনে খুশি হন।

সাবি ঠাইরেন ঘাট্‌লায় এসে উলুধ্বনি দিলেন। তাঁর কন্যা জুল্‌ফির স্বামীর চাকরি হয়েছে, পত্র এসেছে। ব্রত অন্তে পোস্টকার্ডখানা সকলের মাঝে পড়া হল, সবাই শুনলেন। সাবি ঠাইরেনও আর-একবার শুনলেন হাসি হাসি মুখ নিয়ে। তিনি পড়তে পারেন না।

উলুধ্বনি হল শুভ-সংকেত। গুণের বাড়ির মেজো মেয়ের বিয়ের পাকা কথা হবে, দু পক্ষের লোক বসেছে গ্রামের পাঁচজনকে নিয়ে। পাঁচজনের সামনে যে কথা সে কথা ফেলতে পারে না কেউ। বিবাহের দিন, দেনাপাওনা, সকল কথা পাকা করে নেওয়া হল, দু পক্ষের কাগজে দু পক্ষ সই করল— রুপোর টাকায় সিঁদুর মাখিয়ে সই-এর উপরে ছাপ পড়ল— সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক ঝাঁক উলুধ্বনি দিয়ে উঠল এয়োস্ত্রীরা। পাড়ার ঘরে ঘরে সবাই জানল, রিনির 'পাটিপত্র' হয়ে গেল।

সবেতেই একটা সুর। সুরে ভেসে আসে সকল খবর ঘরে ঘরে।

চৌধুরী বাড়ির ছোটো চৌধুরীর মেয়ে মরণী চলেছে শ্বশুরবাড়ি— মরণী ছেলেবেলায় অসুখে ভুগে মরতে মরতে বেঁচে উঠেছে। সেই থেকে নাম 'মরণী' হয়ে আছে। কতবারই তো মরণী শ্বশুরবাড়ি গেল, যতবার যায় কাঁদতে কাঁদতে যায়। দূর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি, সিদ্ধেশ্বরীতলা ছাড়িয়ে দু-তিনটা ক্ষেত পার হয়ে 'ডুলি' যখন অদৃশ্য হয়— তখনো তার কান্নার সুর ভেসে আসে। একটা একটানা মিহি সুর 'ডুলি'র ঝাঁকুনি খেয়ে নেচে নেচে আসে যেন।

কান্নার সুর শুনে বোঝা যায় কোন্ পথে কোন্ পাড়ার মেয়ে আজ চলেছে শ্বশুরঘরে। এই কাঁদাটাই স্বাভাবিক।

মা'র বাতাসী বইনের মেয়ে সরলা গেল শ্বশুরবাড়ি— প্রথমবার। সরলা কাঁদল খুবই; কিন্তু দূর থেকে শোনা গেল না বেশিক্ষণ। গিন্নিরা বললেন, 'কী পাষাণী মেয়ে গো বাতাসী!'

এই কান্নার মধ্যেও আছে কত রকমের সুর। সুর শুনে বোঝা যায় কিসের কান্না।

শশধর চৌধুরী বউকে ধরে মারে, সেই কান্নার সুর আর-এক রকমের। আর শোকের যে কান্না— তার সুর একেবারে আলাদা।

ও পাড়ার মধু দত্ত মারা গেলেন; তাঁর স্ত্রী ও বুড়ি মা কাঁদেন। দিনে দুপুরে মাঝরাতে যখন তখন তাঁদের কান্নার সুর ভেসে আসে। এ কান্না শুনে বুকটা আলু-থালু করে ওঠে।

বর্ষায় নৌকো, উন্নায় ডুলি; এই হল মেয়েদের ভিন গাঁয়ে যাবার যানবাহন। 'ডুলি' হল একটা জলচৌকির মতো 'চারপাই'; দড়িতে বোনা। চারপাই-এর চার কোণায় চার বাঁশের লাঠি, এই লাঠি কয়টা উপর দিকে একত্র করে বেঁধে, একটা মোটা লম্বা মজবুত বাঁশ গলিয়ে দেয় এর ভিতরে। মাঝামাঝি জায়গায় খুব শক্ত করে বাঁধে ডুলির বাঁশ কয়টাকে মোটা বাঁশের সঙ্গে। দুদিকে মোটা বাঁশটা বেরিয়ে থাকে অনেকখানি করে, আগে-পিছনে চার বেহারা সেটা কাঁধে তুলে নেয়। মধ্যিখানে ডুলি ঝোলে। একটা শাড়ি দু ভাঁজ করে ডুলির চার দিকে ঘুরিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় বউ-ঝি ডুলিতে উঠবার কালে।

ছোট্ট হাল্কা ডুলি, ঘাড় গুঁজে বসতে হয়। 'হেঁইও, হেঁইও' করে ডুলি কাঁধে ছোটে বেহারা। ডুলির ঝাঁকুনিতে ঘাড়ে গায়ে ব্যথা ধরে।

ডুলি চলে।

ডুলির কাপড় হাতের আঙুলে সন্তর্পণে ফাঁক করে বউ দেখে ডুলি ক্ষেত পার হয়, খাল পার হয়। দেখে সাদা মেঘ, সবুজ মাঠ। দেখে সূর্যাস্তের রঙে রাঙানো রঙিন বিলের জল।

উন্নার দিনে স্টিমার ঘাটে যেতেও এই পথে যায় সকলে। মেয়ে যেতে কাঁদে, বউ যেতে হাসে। নন্দীবাড়ির ঘাট্‌লা খালি থাকে না কখনো।

ঘাট্‌লার পাড়ে সকালের আসর ভাঙলে আসে পাড়ার বউরা স্নান করতে। দু বাহুতে ঢেউ তুলে তুলে উপরের জলজ পানা সরিয়ে টলটলে জলে টুপ টুপ ডুব দেয়। মাথার ঘোমটা সরে না একটুও। আশে-পাশে বড়োরা কেউ না থাকলে বউ এদিক ওদিক দেখে দু-চার হাত সাঁতার কেটে নেয় এক ফাঁকে। যেন হালকা ফলিমাছটা খেলা করে ওঠে জলের উপরে।

স্নান করে বুক জলে দাঁড়িয়ে পিতলের কলসিতে জল ভরে বউ পারে ওঠে। জলে-ভিজা শাড়ি দু পায়ে জাপটে থাকে। নিচু হয়ে দু হাতে পায়ের কাছের

কাপড়ের জল নিঙড়ে নিয়ে, লাল গামছাখানা বুকে জড়িয়ে বউ কলসি কাঁখে বাড়ির পথ ধরে।

এর পর আসেন পুরুষেরা স্নান করতে। আসেন বয়স্কারা, বৃদ্ধারা। ছোটোর দল জলের পোকা, তারা সর্বক্ষণই ফোয়ারা তুলছে জলে।

আসতেই থাকে লোক। স্নান করতে আসে, জল তুলতে আসে, আসে কাপড় কাচতে, বাসন ধুতে। আর খাবার পর আসেন প্রবীণার দল ঘাটে মুখ ধুতে। এসে বাকি রেলাটুকু কাটিয়ে দেন সেখানে— কার ঘরে কি রান্না হল, কে কি দিয়ে ভাত খেল, ভালোমন্দ নানা সমাচার নিয়ে।

ঘাট খালি থাকে না সারাদিনে।

১১

ছোটোদের দিয়ে বারব্রত করানোর খুব উৎসাহ দিদিমার। পাড়ার মেয়েরা এই বয়সে সবাই নানা ব্রত করে। দিদিমা আমাদের 'লালুব্রত' ধরিয়ে দিলেন।

দু খানা ছোটো ছোটো কাঠের পিঁড়ি বানিয়ে দিলেন আমাদের দু বোনকে। পিঁড়ির উপর বিকেলবেলা পুকুরপাড়ের নরম মাটি দিয়ে না-শিব না-মন্দির গোছের একটা স্তূপ বানাই। এটা হল 'লালু'। যত রকম রঙ-বেরঙের ফুল পাই তুলি, যে ফুল রাতভর তাজা থাকবে বেছে বেছে সেই-সব ফুলই তুলি। তার পর সন্ধেবেলা ঘরে বসে প্রদীপের আলোতে লালুকে ফুল দিয়ে সাজাই। দিদিমা দেখিয়ে দেন।

অতসীফুল দিয়ে লালুকে সাজাতে সবচেয়ে ভালো। অতসীফুলের বোঁটাটা লালুর নরম গায়ে গেঁথে যায়, ফুলটা আটকে থাকে। লালুর গা দেখা গেলে দোষ। ফুলে ফুলে লালুর সর্বাঙ্গ ঢেকে দিতে হয়। গোল করে সারি সারি অতসীফুল ঘিরে লালুকে ঢেকে পরে গাঁদা টগর কল্‌কে ফুলে পিঁড়িখানি ফুলে রঙে সাজিয়ে খাটের নীচে ঠেলে রেখে দিয়ে ঘুমোতে যাই।

এই লালু সাজানো নিয়ে থাকে ব্রতকারিণীদের মনে একটা প্রচ্ছন্ন আড়াআড়ি, কার লালু বেশি সুন্দর।

ভোরবেলা কাক-পক্ষী না ডাকতে দিদিমা আমাদের ডেকে ওঠান। আমাদের মাথা ঢেকে গা ঢেকে কাঁথা একটা জড়িয়ে নিয়ে পিছনে ঘাড়ের উপরে একটা বড়ো করে গিঁট বেঁধে দেন। আমরা ঘুমে-ভরা চোখ নিয়ে লালুসমেত পিঁড়িখানি হাতে ধরে দিদিমার সঙ্গে সঙ্গে চলি। ফুলের সাজি হাতে দিদিমা আমাদের সঙ্গে থাকেন। শুকতারাটি আকাশে জ্বলজ্বল করে।

সূর্য ওঠার আগে করতে হয় এই ব্রত, পুকুরঘাটে বসে।

শীতের কুয়াশা— ভারী কুয়াশা। এই কুয়াশা ঠেলে ঠেলে পথ চলি। দু পাশে 'মটকিলা' গাছের ঝোপ, চওড়া পাতাগুলি হতে টস্‌টস্‌ করে শিশির পড়ে মাটিতে, ভিজে ঘাস দু পা ভিজিয়ে দেয়।

'ঘাট্‌লা'য় আসি। বাসু নিরু আসে; পুবের বাড়ির সুনীতি নলিনী আসে। সিঙ্গি বাড়ির ঘাটেও বসে গেছে ততক্ষণে চুনি-ইন্দুরা একদল। কে আগে ঘাটে আসব, কে আগে ব্রত শুরু করব এ নিয়েও থাকে প্রতিযোগিতা মনে।

আমরা জলের কাছের সিঁড়িটার উপর লালুকে সামনে রেখে বসি। পুকুরের জলে ঘন কুয়াশা, যেন একটা সাদা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। এই কুয়াশা এখন ভাঙতে হবে আমাদের; কুয়াশা ভাঙলে তবে উঠবেন সুয্যিঠাকুর আকাশে। এর জন্যই এই ব্রত, লালুকে উপলক্ষ করে।

দিদিমা দেখিয়ে দেন।

আমরা ফুলের সাজি থেকে একটি একটি করে ফুল তুলে নিয়ে জলে ছুঁড়ি আর সুর করে ছড়া বলি—

'খুয়া ভাঙ্গি খুয়া ভাঙ্গি এ্যাচলার আগে,
সকল খুয়া গেল বড়োই গাছটির আগে।'

নীচ থেকে খুয়া বড়োই গাছটার মাথায় উঠে গেল তো আর কিসের দেরি? বলি—

'উঠো উঠো সুয্যিঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া,
না উঠিতে পারি মোরা শিশিরের লেইগা।'

কিন্তু এক সমস্যা— সুয্যিঠাকুর যে উঠবেন, কোন্‌খান দিয়ে উঠবেন? সবাই চাই— আমাদের নিজ নিজ ঘাট দিয়ে উঠুন। তাড়াতাড়ি ফুল ছিটিয়ে বলে উঠি—

সুয্যি উঠবেন কোনখান দিয়া?
না বোসের বাড়ির ঘাটখান দিয়া।'

মামারা 'বসু'। ও দিকে নিরু নলিনী আমাদের আগেই ওদের নিজেদের ঘাটের নাম বলে ফেলেছে। ও পারের চুনি-ইন্দুরা শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচাচ্ছে— 'সিঙ্গি বাড়ির ঘাটখান দিয়া'।

তা, সুয্যিঠাকুরের ওঠা নিয়ে কথা, উঠলেই হল।

সুয্যিঠাকুর উঠলেন।

দিন শুরু করতে হয় এবারে। মেয়েদের সর্বপ্রথম চিন্তা রান্নাবান্না নিয়ে। মাছ চাই। সমানে জলে ফুল ছিটিয়ে যাই, সুরে সুরে ছড়া বলি। ঘাটে ঘাটে জাল ফেলা হয়, কোনো ঘাটেই মাছ ওঠে না। শেষে যখন—

'মামাদের পুকুরেতে ফালাইলাম জাল,
তাতে উঠল এক রাঘব বোয়াল।'

এইখানটায় সব ব্রতিনীরাই মতে এক। সবারই মামাবাড়ির পুকুরে রাঘব বোয়াল উঠল।

মাছ তো উঠল। কিন্তু এই এত বড়ো মাছ কুটবে কে?

—'ঐ যে আসে কুটোনী দাও হাতে কইর‍্যা'।

কুটোনী এসে মাছ কুটে দেবে, এতেও আবার আত্মসম্মানে লাগে। অকম্মা তো নই? যেমন করে পারি নিজেই করব। তাড়িয়ে দিই তাকে। বলি—

'যা যা, কুটোনী ধাক্কা ধুক্কা খাইয়্যা,
আপুনি কুটুম অনে যেমন তেমন কইর‍্যা।'

—কুটলাম তো, ধুইবো কে?

—'ঐ যে আসে ধুওনী ডুলা হাতে কইর‍্যা।'

'যা যা ধুওনী ধাক্কা ধুক্কা খাইয়্যা,
আপুনি ধুমু অনে যেমন তেমন কইর‍্যা।'

কোটা, ধোওয়া, মশলা বাটা, রান্না সবেতে যে-ই কাজ করতে আসে তাকেই ফিরিয়ে দিই; নিজেই করে ফেলি সব কাজ। সব যখন হল— রান্নার পরে খাওয়ার সময়—'খাইবো কে'?

—'ঐ যে আসে খাওনী থালা হাতে কইর‍্যা'।

এতই যদি পারলাম, এই কাজটা কি আর পারব না?

'যা যা খাওনী ধাক্কা ধুক্কা খাইয়্যা,
আপুনি খামু অনে যেমন তেমন কইর‍্যা।'

শুধু রান্না-খাওয়াই সব নয়। আরো কত কাজ কত ব্যাপার আছে সংসারে। লালুর পৈতে হয়, লালু ঘাটে নেমে স্নান করে, পৈতা মাজে। সেই পৈতা-ধোওয়া জল পুকুরের জলে ভাসে। তাই দেখে— এ ঘাটে ও ঘাটে একে অন্যের উদ্দেশে বলে—

'তাই দেইখ্যা 'অমুক অমুক' খলখলাইয়্যা হাসে'।
লালু বিয়ে করতে যায়।

'জলের মধ্যে ছিপছিপানী কিসের বাদ্য বাজে,
চান্দের বেঁটা লাউল্যা আজ বিয়া করতে সাজে।
সাজোরে সাজোরে লাউল্যা সোনার নূপুর দিয়া,
ঘরে আছে সুন্দরী কন্যা তুইল্যা দিমু বিয়া।'

তার পর লালু বউ নিয়ে এল। 'ঝিকুটি' খেলতে গিয়ে কিছু টাকা পেলাম, সেই টাকা দিয়ে বউকে শাঁখা কিনে দিলাম। আরো টাকা হাতে থেকে গেল।—

'লাউল্যার বউরে শাঁখা দিয়া বেশি হইল টাকা
সেই টাকা দিয়া দিলাম মায়েরে শাঁখা।'

সবাই নিজ নিজ মাকে শাঁখা দেয়। আমি দিদি দিই মামীদের। আমাদের মা যে আর শাঁখা পরতে পারেন না।

লাউল্যার বউ 'সাধন্তি' হয়। এ সময়ে নানা কিছু খেতে সাধ হয়। তাও জিজ্ঞেস করতে ভুল হয় না আমাদের।

—'লাউল্যার বউ লো সাধন্তি কি কি খাইতে সাধ?' কেউ বলে, 'বড়োইর অম্বল, কড়কড়া ভাত', কেউ বলে, 'ইলসামাছ পোড়া আর পান্তা ভাত।'

'লাউল্যার বর্‌ত' শেষ হয়। পিঁড়িটা তুলে জলে ডুবিয়ে ধরি, আস্তে আস্তে নাড়ি। লালু আলগা হয়ে জলে পড়ে যায়, ফুলগুলি ভাসে উপরে। পিঁড়িখানা ধুয়ে পথে ফুল ছিটিয়ে ছিটিয়ে বাড়ি ফিরি, কাউকে ভুলি না, বলি—

—'আমরা পূজি পথ, আমাগো হউক সোনার রথ'।

ততক্ষণে সুয্যিঠাকুর লাল চেলী ছেড়ে থানধুতি পরেন।

বিকেলে আবার 'লালু' গড়ি, ফুল তুলি, লালু সাজাই। একমাস এমনি করি, একদিনও বাদ পড়ে না। রোজ নতুন নতুন রঙে নকশায় লালুকে সাজাই। মুখে কিছু বলি না, ঘাটে বসে জলে ফুল ছুড়তে ছুড়তে আড়ে আড়ে এ ওর লালুকে দেখি। দেখি, কার কেরামতি বেশি।

'তারা-ব্রত'ও করলাম আমরা। দিদিমার শখেই করি সব। দিদিমা নইলে আমাদের নিয়ে এত ধৈর্য কার?

প্রতিদিন বিকেলে উঠোনের মাঝখানটা লেপিয়ে মামীদের দিয়ে আলপনা দিইয়ে রাখেন। তারা-ব্রতে আলপনাই প্রধান। আমরাও দিই মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে।

মধ্যিখানে একটা গোল আলপনা— এটা 'ভূমণ্ডল', এর মাথায় পূর্বদিকে একটু ছোটো গোল— এটা সূর্য। নীচে পশ্চিমদিকে চন্দ্র; চন্দ্রের গড়ন নৌকোর মতো। চন্দ্র সূর্য ভূমণ্ডল মিলিয়ে পুরো একটা আলপনা। চন্দ্রের নীচের দিকে আলপনার আসন, পাশে আয়না চিরুনি ঝাঁপি চুলের কাঁটা চুড়ি বাজু চৌকি পালঙ্ক ধানের গোলা যাবতীয় দ্রব্য অলংকার। সব আলপনায় আঁকা।

সন্ধেবেলা আকাশে তারা ফুটতেই মাঠ বাটে যেখানে আছি খেলাধুলো ফেলে ছুটে আসি। ঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়ে আলপনার আসনে এসে দাঁড়াই। আমার আলপনা দিদির আলপনা আলাদা আলাদা। দিদিমা যার যার হাতে এক এক মুঠো ফুল তুলে দেন। বাঁ হাতে ফুলগুলি ধরে ডান হাতে একটি একটি করে ফুল নিয়ে আলপনায় ছিটোই, আর বলি—

'এক তারা, দুই তারা,
ষোলো ষোলো তারা
তোমরা হইও সাক্ষী'—।

ষোলো তারার নামে ষোলোটি ফুল ছিটিয়ে তাদের সাক্ষী রাখি— যে, আমি পুজো করছি।

সব পুজোতে সাক্ষী রাখতে হয়; এই সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপরেই নির্ভর করে ফলাফল।

ফুল ছিটিয়ে ষোলো তারাকে পুজো করি, ভূমণ্ডলকে পুজো করি, চন্দ্র সূর্যকে পুজো করি, ধানের গোলা, দ্রব্য অলংকারকেও করি। বলি,

'আজ পূজি আমি এই চিরুনি,
আমার যেন হয় সোনার চিরুনি।
আজ পূজি আমি এই বাজু,
আমার যেন হয় সোনার বাজু।'

সকল সুখ-সৌভাগ্যের জন্যই প্রার্থনা জানাতে হয় ভগবানকে।

মর্তে কুমারীরা 'তারা-ব্রত' করে; শিব দুর্গা রথে বসে আকাশপথে ভ্রমণ করেন।

শংকর জিজ্ঞাসেন গৌরীকে— 'এই ব্রত করলে কি হয়?'

গৌরী বলেন—

'শিবের মতো স্বামী পায়
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
জয়াবিজয়া দাসী পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়;
—আর
অন্তে শিবদুর্গার চরণ পায়।'

এ ব্রতও পুরো মাস করলাম— প্রতি সন্ধ্যায়। মাসের শেষের দিন ব্রত সাঙ্গের দিন। এ দিন আলপনা অনেক বড়ো আকারে দেওয়া হল। পাড়া প্রতিবেশীকে আহ্বান করে 'হরির লুট' হল। বারকোষ ভরা বাতাসা চালকলা নারকেল শশার প্রসাদ বিতরণ হল।

সুনীতি নলিনীরা করল 'মাঘমণ্ডল' ব্রত, 'পুণ্যিপুকুর' ব্রত।

মাঘমণ্ডল ব্রত পাঁচ বছরে সাঙ্গ হয়। প্রতি মাঘ মাসে হয় ব্রত।

এক বছরে এক গোলের আলপনা, দু বছরে দু গোলের। এক গোলের গায়ে আর-একটা বৃত্ত দাগা হল। তিন বছরে তিনটি বৃত্ত, চার বছরে চারটি— আর পাঁচ বছরে পর পর রেখা টানা পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড একটা আলপনা হল।

মাঘমণ্ডলের ব্রতের আলপনা পিটুলির গোলা দিয়ে নয়, গুঁড়ো দিয়ে দিতে হয়। রঙিন আলপনা। সুনীতি আতপ চালের গুঁড়োয় রঙ মিশিয়ে নানা রঙের গুঁড়ো করে নারকেলের মালা ভরে ভরে রেখে দিত। হলুদ মিশিয়ে হলুদ রঙ, সিঁদুর মিশিয়ে লাল, ধানের তুষ পুড়িয়ে কালো, বেলপাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে তা মিশিয়ে হত সবুজ। আর চালের গুঁড়ো তো সাদাই।

রোজ এই-সব গুঁড়ো দু আঙুলের টিপে নিয়ে লতা পথ কত নকশার আলপনা দেয় সুনীতি। গুঁড়ো দিয়ে আলপনা দেবার কায়দা আলাদা। আঙুল দুটো একটু একটু নাড়ে আর ঝুরঝুর করে গুঁড়ো পড়ে তা থেকে। ম্যাজিকের মতো আলপনা আঁকা হয়ে যায়। সুনীতির এ আলপনার হাত বড়ো পরিষ্কার, একটু গুঁড়ো নকশার এদিক ওদিক পড়ে না কখনো।

'পুণ্যিপুকুর' 'যমপুকুর' ব্রতে আবার আলপনা নেই। এই ব্রতে গড়ার কাজ। উঠোনে খেলার পুকুরের মতো পুকুর বানিয়ে পুকুরের মাঝখানে একটা কাঠির উপরে একটা চিল গড়ে বসিয়ে দিতে হয়। চার কোণায় চার কাক জল খায়। আর, পাড়ে যমবুড়ি বসে থাকে।

রোজ মাটি দিয়ে গড়ে এ সমস্ত সুনীতি, রোজ ফেলে দেয় ব্রতের পরে।

পুকুর কাটানো, জলদান করা, এ হল মহাপুণ্য কাজ। ব্রতের সব শেষের কথা—

'জল পাইল, জল খাইল;—
জল খাইয়্যা বুড়ি স্বর্গে গেল।'

মামীরাও কত ব্রত করেন। মাসে মাসে ব্রত, 'নাটাই-মঙ্গলচণ্ডী' ব্রত করেন অগ্রহায়ণ মাসে। রোজ সন্ধের শঙ্খ বেজে উঠলেই ব্রতে বসেন মামীরা। কলাপাতার

'মাইজে' থাকে 'পিঠা'। চালবাটা দিয়ে এই পিঠা তৈরি করে রাখেন তাঁরা বিকেলবেলা। যে ব্রতের যে নিয়ম। এই ব্রতে আলুনী, লবনী দু রকমের পিঠে লাগে। নুন দিয়ে তিনখানা, নুন ছাড়া চারখানা। এক এক মাইজে সাতখানা করে চালের পিঠা চাই।

ব্রতকথার পরে প্রসাদী পিঠা হাতে নিয়ে মামীরা ঘরের বাইরে— টিনের চালটা এসে নেমেছে যেখানে আঁধার আঁধার স্থান, সেই 'ছাইচে'র তলায় দাঁড়িয়ে প্রসাদ খান। নিয়ম তাই। ব্রতকথার শেষে আছে এই প্রসাদ খাবার পন্থা—

'জ্যোৎস্নায় রান্ধে আন্ধারে খায়
যেই বর মাগে সেই বর পায়।'

তাই বিকেলে দিনের আলো থাকতে থাকতে ব্রতের পিঠে তৈরি করে রাখেন তাঁরা। আরো একটা নিয়ম, কথা বলতে নেই ব্রত শুরু থেকে প্রসাদ খাওয়া সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত।

রোজই শুনি, চাপা গলায় হাসাহাসি করছেন মামীরা 'ছাইচে' দাঁড়িয়ে অন্ধকারে বোবা হয়ে একে অন্যের প্রসাদ খাওয়ার ভঙ্গি দেখে।

১২

গ্রামে একটা বিয়ে হলে সারা গ্রামে যেন উৎসব লেগে যায়। ছোটোদের হুল্লোড়, মেয়েদের গান, পুরুষের হাঁকডাক, কাজের লোকের চেঁচামেচি, ঢাক সানাই শঙ্খ উলুধ্বনি— সব মিলিয়ে সুরৈ শব্দে হাওয়াটা চঞ্চল হয়ে থাকে কয়দিন।

বিয়ের আগের দিন অধিবাস। ভোর রাত্রে 'জল ভরতে' যায়; গঙ্গাকে নিমন্ত্রণ করে আসে। একজোড়া দম্পতি নব-বরবধূর মতো আঁচলে আঁচলে গিঁট বেঁধে পথ চলেন। স্ত্রীর কাঁখে থাকে কলসি, স্বামীর হাতে তলোয়ার।

যার বিয়ে তার দাদা-বউদি সম্পর্কের জন হলেই ভালো হয়। নয়তো দিদা-দাদুকে দিয়েও হয়। হাসি উল্লাসে এ কাজ করতে হয়। যাঁরা এ অনুষ্ঠান করেন, খুব খুশি মনেই করেন। কারণ এর মধ্যে একটা বিশেষ ইঙ্গিতও থাকে। স্বামীসোহাগিনী নারীই এ কাজের জন্য বহাল হন। তাই একটু গরবিনী ভাব থাকে কলসি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলবার কালে।

এখানে নদীই গঙ্গা। মা-গঙ্গাকে বিধিমতো নিমন্ত্রণ করার পর স্বামী হাতের তলোয়ার দিয়ে স্রোতের জল কাটেন, স্ত্রী সেই জল কলসি ভরে তুলে আনেন। এই জল দিয়ে বাসিবিয়ের দিন বরকনেকে স্নান করান এয়োস্ত্রীরা মিলে।

ছেলে-বুড়ো-সমেত আধখানা গ্রাম যায় এইসঙ্গে। 'জলভরা'র গান গাইতে গাইতে চলেন একদল সধবা।

এই 'জলভরা'য় যাবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকি। শেষ রাত থেকে সানাই বাজতে থাকে বিয়েবাড়িতে। বিছানায় কান পেতে থাকি। সানাইয়ের সুর ডিঙিয়ে যেই ঢাকের বাদ্যি কানে এল, উঠে ছুটে গিয়ে 'জলভরা'র দলে ভিড়ি।

আর-একটা ব্যাপারেও এমনি উৎসাহ থাকে, নববধূ যখন প্রথম আসে শ্বশুরবাড়িতে তা দেখতে।

ঘোষের বাড়ির ছেলে বিয়ে করতে গেছে, বউ আসবে আজ। দূরের পথ, নৌকোয় আসা। কখন আসে, কখন আসে। উঠোনে 'বউ ছত্রে'র আলপনা দিয়ে বরণকুলো সাজিয়ে বসে আছেন সবাই। একটা গ্যাসের বাতি জ্বলছে কেঁপে কেঁপে একধারে।

দুপুররাত্রে এসে পৌঁছল বর-বউ।

রাঙা চেলি পরা, দু হাতে বুকের কাছে লাল টুকটুকে 'গাছ-কৌটো'টি চেপে ধরা, কনেবউটি যখন এসে আলপনার মাঝখানে রাখা দুধে-আলতায় গোলা পাথরের থালাখানায় ছোটো ছোটো পা দুখানি ডুবিয়ে দাঁড়াল, মনে হল যেন লক্ষ্মীঠাক্‌রুন এসে দাঁড়ালেন লাল পদ্মটির উপরে।

মা'র সব চেয়ে ছোটো দু ভাই এর উপরে যে দু ভাই— আমাদের দুদুমামা আর নীলুমামা— তাঁদের বিয়ে ঠিক হল। একই দিনে দুজায়গা থেকে 'অধিবাস' এল। একই দিনে দুজনের 'গায়ে হলুদ' হল। একই দিনে দুজনে চন্দন পরে দর্পণ হাতে নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। বর নিয়ে দুদল বরযাত্রী দু নৌকোতে করে দু গ্রামের দিকে রওনা হয়ে গেল।

মামাদের বিয়ে ঠিক হয় দুমাস আগে। দিদিমা পাড়া-পড়শী গ্রামবাসী সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন।

পরদিন থেকে রোজ দুপুরে রান্নাখাওয়ার পাট সেরে কোলের সন্তানটিকে কাঁখে নিয়ে গ্রামের সধবা গায়িকার দল চলে আসেন এ বাড়িতে। উঠোনের পুব ধারে গোপালভোগ আমগাছটার তলায় পিঁড়ি পাতা থাকে, তাঁরা দুদলে ভাগাভাগি করে বসেন। সামনে রাখা থাকে পান সুপারি দোক্তা জাঁতি, তেল-সিঁদুর বড়ো একটা রেকাবিতে করে। দু-এক ফোঁটা তেলে সিঁদুরটা গুলে রাখা হয় একটা পাতার উপরে। সকল শুভকাজে এইরকম করেই সিঁদুর রাখার নিয়ম।

গায়িকারা তেল-সিঁদুর কপালে দিয়ে পান মুখে নিয়ে গান শুরু করেন। একদল গানের একটা কলি গেয়ে দেন, অন্যদল সেটা ফিরে গান। পর পর অনেকগুলি গানই হয় এইরকম করে। বেলা পড়লে গান থামিয়ে যে যার ঘরে ফেরেন। রোজ চলে এই গান। গানেই বিয়ের যাবতীয় কর্ম অনুষ্ঠান ঘোষণা করা হয়।

বিয়েবাড়িতে কাজের অন্ত নেই। দিনে দিনে গানে গানে কাজের কথা, জিনিসের ফর্দ বেড়েই চলে।

রাম-সীতাকে নিয়েই সকল গান। পাত্রের মা— রামের মা; পাত্রীর মা— সীতার মা।

গাইয়ের দল সুর তোলেন— ওগো ও রামের মা, তোমার হলুদ কোটা শুরু করো গো। ডালা ভরো, কুলো ভরো হলুদ কুটে কুটে।

—ওগো ও রামের মা— ধান কুটো গো। জালা ভরো ধামা ভরো— তোমার রামচন্দ্রের যে বিয়া গো।

শীতলপাটি বোনো— রাম-সীতা বসে পাশা খেলবেন।

জোলার বাড়ি খবর দাও— লালশাড়ি বুনতে, মালীকে খবর দাও টোপর মুকুট বানাতে, সুপারি কাটো, পান সাজো, ক্ষীর সন্দেশ বানাও, পুকুরে জাল ফেলো— সে কত কাজের ফর্দ।

গায়িকারা হাসেন আর পর্বতপ্রমাণ জিনিসের ফরমাশ গান। দিদিমা দিনের কাজে এ ঘর ও ঘর করেন। শোনেন, আর হাসেন।

এই গান চলতে চলতে এলো অধিবাসের অনুষ্ঠান— 'ওগো রামের মা, তোমার রামচন্দ্র স্নান করবে, জল ভরো গো সোনার কলসিতে করে।' কলসি ভরা জল এল। এবার গান হয়—

'—তোরা আয় লো সকলে,
আমার রামচন্দ্রকে স্নান করাব সুশীতল জলে।'

রামের স্নান হল, মঙ্গলাচরণ হল, রামচন্দ্র বিয়ে করতে চলে গেলেন।

গান চলতে থাকল।

রামচন্দ্র বউ নিয়ে ফিরে এলেন, বধূবরণ হল। রামচন্দ্র এবারে ঘরে ঢুকে সীতার সঙ্গে পাশা খেলতে বসলেন— গানে গানে সকল বিবরণ। বিয়ে-বাড়ি গম্‌গম্‌ করে গানে।

দুই মামা দুই বউ নিয়ে এলেন।

দুই বউই শ্রীমতী। নীলুমামী একটু বড়োসড়ো, দুদুমামী একেবারে একটি খুকি। দুদুমামীর গায়ের বর্ণ গৌর। সবাই বললেন, 'সব্‌রিকলার মতো গায়ের রঙ বউর।'

দুদুমামী যখন যে শাড়ি পরেন, শাড়ির ভিতর দিয়ে গায়ের রঙ যেন ফুটে বের হতে চায়। বিশেষ করে যখন নীলাম্বরী শাড়ি পরেন।

ছোট্ট দুদুমামী মস্ত ঘোমটা টেনে গুটগুট করে উঠোন পারাপার করেন; কখনো রান্নাঘরে যান, কখনো পুকুরঘাট থেকে ছোটো একটা পিতলের কলসি কাঁখে জল নিয়ে আসেন— কী সুন্দর যে লাগে তখন দেখতে। সবাই বলে 'এ যেন চীনের পুতুল'। এই নামকরণের আর-একটা কারণও আছে, দুদুমামীর নাকটি একটু চাপা।

মা বলেন, 'তা হোক, নাক তো ঘোমটাতেই ঢাকা থাকে। দুদুবউর হাত-পায়ের গড়নখানি দেখো তো— যেন লক্ষ্মীর হাত পা!'

এই দুদুমামীই একদিন একটা কাকে খাওয়া আধখানা আমের জন্য সমবয়সী দিদির কাছে কত কাকুতি-মিনতি করলেন।

বউমানুষ বাড়ির বাইরে পা ফেলতে পারেন না। পশ্চিমভিটায় রান্নাঘরের পিছনে আছে নন্দীদের একটা প্রকাণ্ড ফজলি আমের গাছ। সব আমের শেষে আম হয় এই গাছে। বড়ো বড়ো আম, আর তেমনি টক।

একদিন একটা পাকা আম কাকে খাচ্ছিল, বোঁটা খসে পড়ে গেল তলায়। এমনিতরোই পড়ে আম যখন-তখন। আমের দিনে কান খাড়া করে থাকি— কোথায় একটা আম পড়ল কি ছুটে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি— কে আগে কুড়িয়ে নেব সেটা। আড়াআড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় এ নিয়ে। আমটা যে পায় তার উল্লাস, আর যে পায় না 'বেচারা বেচারা' মুখখানা হয়ে যায় দুঃখে।

পাকা আম তলায় পড়ার শব্দই আলাদা।

এ দিন এইরকম একটা আম তলায় পড়ল। শুনে আমি ছুটলাম, দিদি ছুটলেন, আরো দু-চার জনও ছুটল। দিদি পেলেন আমটা।

রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছিলেন দুদুমামী। আম নিয়ে দিদি বাড়ির ভিতরে এলে দুদুমামী ছুটে এসে দিদির দুহাত জাপটে ধরলেন। বললেন, 'ও বড়ো ভাগ্নী, এই আমটা আমারে দিবা?'

লোভও দেখালেন, বললেন, 'আসে বছর আমি যখন বাড়ি যামু, তোমার নেইগ্যা এক 'আগইল' আম আনুম অনে।'

এত প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও আমটা পেলেন না দুদুমামী।

আমাদের গ্রাম মনে পড়ে না আমার। মা'র মুখে শুনি সে গ্রাম ছিল পদ্মার পারে। বাবা শখ করে ফিরে আবার বাড়িঘর তুলেছিলেন নতুন করে কর্ম-অন্তে থাকবেন

বলে। যে বছর বাবা মারা যান, সে বছর ফাটল ধরল ভূমিতে। পরের বছর ধসে পড়ল গোটা গ্রাম পদ্মার বুকে।

তাই দেশ বলতে জানি মা'র বাপের বাড়ির দেশ, গ্রাম বলতে জানি মা'র বাপের বাড়ির গ্রাম। এই গ্রামের মাটির সঙ্গেই সকল গ্রামের মাটির যোগ আমার।

ছোটো দুই মামা বাদে সব মামারাই থাকেন কেউ কলকাতা, কেউ ঢাকায় কেউ আসানসোলে। পুজোর ছুটিতে সবাই আসেন গ্রামে।

সব মামারই মাছ ধরার খুব শখ। বিল যখন জলে থৈ থৈ, মামারা যে যার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আলাদা আলাদা নৌকোয় আলাদা আলাদা বিলে চলে যান মাছ ধরতে।

যেদিন যান সেদিন সকাল থেকে শুরু হয় তোড়জোড়। দড়ি পাকানো হয়। উঠোনের এ মাথায় ও মাথায় দুজন দাঁড়িয়ে হাতের তেলোয় পাক দেন দড়িতে। মোটা শক্ত হওয়া চাই দড়ি। বড়ো বড়ো বঁড়শি আনা হয় কিনে। লম্বা পোক্ত দড়িটায় কিছু ফারাক ফারাক হাত, সোওয়া হাত মতো লম্বা সরু দড়ি বাঁধেন এক সারি। এগুলি ঝুলতে থাকে বড়ো দড়িটার গায়ে। সঙ্গে প্রতিটাতে একটা করে বঁড়শি। বিলের জলে দু দিকে বাঁশ পুঁতে লম্বা দড়িটা বেঁধে টাঙিয়ে দেবেন। জলের উপরে এমনভাবে টাঙাবেন যে ঠিক জল ছুঁয়ে থাকবে বঁড়শিটা। বঁড়শিতে গাঁথা থাকে একটা করে কই কি শিঙি মাছ। কই-শিঙির প্রাণ— বড়ো কঠিন প্রাণ, মরে না সহজে। জলের উপরে বঁড়শি গাঁথা এই কই-শিঙিগুলি কিলবিল নড়ে, বড়ো মাছ বড়ো হাঁ করে গিলতে এসে আটকা পড়ে যায় বঁড়শির কাঁটায়।

তার পর ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি— জল তোলপাড়। একটু দূরে নৌকো নিয়ে বসে থাকেন মাছ-ধরিয়েরা— শব্দ শুনে কাছে গিয়ে মাছ খুলে নেন; আবার একটা কই-শিঙি গেঁথে দেন তাতে।

মাছ ধরবার তোড়জোড় সব ঠিক করে ছোটো ছোটো জিয়ল মাছে একটা হাঁড়ি ভরে মামারা রওনা হন সারারাত্রির জন্য, বিলের জলে 'জিলা' গাঁথতে। গামলাভরা রাত্রের খাবার নিয়ে যান সঙ্গে, নৌকোয় বসে খাবেন সকলে মিলে।

'জিলা'য় পড়ে বড়ো বড়ো মাছ। ঢাইন, বোয়াল এই-সব মাছই পড়ে বেশি। রাতভর জেগে মাছ ধরে ফেরেন মামারা। এক-একজনের নৌকো থেকে মাছ এনে ফেলা হয় উঠোনে। তার পর যাচাই চলে, কার মাছ গুনতিতে বেশি, কার মাছ ওজনে। কার বোয়ালটা সাদা, কারটা কালো। কালো বোয়ালের স্বাদ অবশ্য বেশি।

আর ধরা হয় কই মাছ শীতকালে। এই মাছ ধরেন ছোটো দুই মামা। শীতকালে জল কম, 'পলো' দিয়ে ধরেন; দেখে দেখে ঝপ করে জলে ফেলে পলোটা চেপে ধরে থাকেন। পলোর সরু মাথা দিয়ে হাত গলিয়ে পলো-বন্দি মাছ কায়দা করে মুঠি চেপে ধরে উপরে তোলেন। আরো-একটা পন্থা আছে তাঁদের কই মাছ ধরার। বাড়ির পুকুরে যখন ধরেন, দেখি।

বড়ো বড়ো কচুরিপানায় ভরা পুকুর। কচুরিপানার শিকড় পাটের গোছার মতো, জলের নীচে ঝুলে থাকে অনেকখানি। এই শিকড়ের মধ্যে শীতকালে কান্‌কো আটকে কই মাছ ঝুলতে থাকে। দিদিমা বলেন, 'ওরা 'ওম্' পায়, তাই অমনি করে থাকে।'

এই সময়ে কচুরিপানা জল থেকে টেনে তুললেই কই মাছগুলিও উঠে আসে সেই সঙ্গে।

মামারা নৌকোর খোল ভর্তি করে কই মাছ নিয়ে আসেন বিল থেকে। অগুনতি মাছ।

শীতকালের কই, বুক-লাল্ কই, তেলে ভরা কই। এই মাছের স্বাদই আলাদা। পরে যখন ডিম হয়ে যায়, মাথাটা বড়ো হয়— মাছটাও লম্বা হয়ে যায়। সে মাছের স্বাদ নেই মোটে।

বড়ো বড়ো মাটির 'চাড়ি'তে কইগুলি জিয়োনো থাকে। রোজ কত কত রান্না হয়, তবু যেন ফুরোয় না মাছ।

আমার সকল মামাই মা'র মতো হাতের কাজে নিপুণ। গ্রামের নারী-পুরুষ কমবেশি সকলেই এই গুণে গুণী। এঁদের আঙুলগুলি যেন সদাই তৈরি সকল কাজের জন্য।

মামাদের মধ্যে আবার মেজোমামার হাত সব চেয়ে নিপুণ। একটা ছোট্ট লিকলিকে ছুরি সবসময়ে মেজোমামার কাছে থাকে। এই ছুরি দিয়ে লম্বা লম্বা বেত থেকে সরু সরু ফিতে বের করে তিনি মামীদের শখের ডালাটা সাজিটা বেঁধে দেন। এই বাঁধুনিই আলাদা, সাজি ঘিরে যেন সরু বেতের এক-একটা নকশা। আমাদেরও আপন আপন সাজি বানিয়ে দেন মেজোমামা নিজের হাতে, মুড়ি খাবার জন্য। অতি সুন্দর সাজি।

এটা হল তাঁর অবসর সময়ের সাথি।

মেজোমামা হাটে-বাজারে, কি এ পাড়া ও পাড়া যান, যেতে যেতে পথে বাঁশঝাড় পেলেন— একটা কঞ্চি কেটে নিলেন। সঙ্গেই থাকে ছুরি; কঞ্চিটা চাঁছতে

চাঁছতে চললেন। কথা বলতে বলতে কঞ্চিটা কাটাকুটি করলেন। বাড়ি যখন ফিরলেন, সেটা কুকুরমুখো নয় হাতিমুখো, নয় তোতা ময়না বসানো একটা শৌখিন ছড়ি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

গ্রামে মেয়েরা একজন কেউ একটা নতুন হাতের কাজ শিখলে বা করলে ঘরে ঘরে তা চালু হয়ে যায়। একবার একজন প্রথমে একটা পাটি বুনলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলের ঝোঁক উঠল পাটি বুনবার। মা মামীরাও পাটি বুনবেন। মেজোমামা মোত্রা কেটে ভিজিয়ে তা থেকে এমন সরু বাকল তুলে দিলেন যে পাটি হল প্রায় শীতলপাটির মতো মিহি।

মেজোমামার হাতের আঙুলগুলি নড়ত চড়ত— বুঝতাম কিছু একটা তৈরি হচ্ছে সেখানে। বাঁশের কৌটো, কাঠের পদ্মকাটা বাটি, এ-সব অবিরত হচ্ছে সে হাতে।

ছোটো কি বড়ো একটা করে ছুরি প্রায় সকল মামার কাছেই থাকে। এটা তাঁদের একটা অভ্যেস। আর, ছোটোমামার কাছে থাকে একটা ধারালো হাত-দা। এই হাত-দা তিনি হাতে ধরে রাখেন সর্বদা। এটা ছাড়া চলতেই পারেন না। বেড়াতে গেলেন কি বাজারে গেলেন কি কারো বাড়িতে ডেকেছে তাঁকে— ডান হাতে হাত-দাটা দোলাতে দোলাতে চললেন।

গাছকোমর-বাঁধা ধুতি পরনে, খালি গা, হাতে চকচকে দা— এই আমাদের ছোটোমামা।

সব রকম কাজের জন্য যেন সদা তৈরি থাকে হাত-দা খানা।

ঘরের বেড়ার বাঁধনটা ঢিলে হয়ে গেছে, বলামাত্র ছোটোমামা হাতের দা দিয়ে বেত চেঁচেছুলে বেঁধে দিলেন বেড়াটা। রান্নাঘরে জ্বালানি কাঠের মাচার খুঁটি নড়বড়ে হয়ে গেছে, ছোটোমামা বোন্নাগাছে ঝপাঝপ কয়েকটা কোপ মেরে নতুন খুঁটি বের করে আনলেন। উঠোনের বড়োই গাছটায় শুঁয়োপোকা লেগেছে, ছোটোমামা গাছে উঠে মুহূর্তে মুড়িয়ে ফেললেন গাছটা।

ছোটোমামার অসাধ্য কাজ নেই কিছু এই দা যতক্ষণ হাতে আছে।

আবার কারো উপরে রাগ হলে এই দা-ই মাথার উপরে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে যান তার উদ্দেশে।

লেখাপড়ায় মন ছিল না মামার। জেলে, নমঃশূদ্র ছেলেদের নিয়ে দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন ছেলেবেলায়। এখনো তাই।

মস্ত একটা দলের অধিপতি ইনি। এই দলের প্রধান কাজ হচ্ছে চোর ধরা আর বিলে বিলে মাছ ধরা।

ছোটোমামা সাঁতার জানেন না, জলে তাঁর ভয় ছোটোকাল থেকে। অথচ জলে জলে মানুষ ইনি। কারবার তাঁর জলের উপরেই সর্বক্ষণ।

স্থির হয়ে ঘরে বসে থাকতে মামাকে দেখে না কেউ। বর্ষাকাল, পথঘাট সব জলের নীচে, কোমর ডুবিয়ে বুক ডুবিয়ে বড়ো বড়ো গাছ এদিকে ওদিকে। হাতের কাছে নৌকো নেই— ছোটোমামা জলে 'চাড়ি' ভাসিয়ে তার ভিতরে বসে দু'হাতে গোল গোল করে জল কাটতে কাটতে বেরিয়ে পড়লেন।

গোরুরা জাব খায় এই-সব চাড়িতে। এ চাড়ি জলেও ভাসে। একজন লোক এর ভিতরে হাঁটুমুড়ে বসে ছোটোখাটো পথ পার হয়ে যায় ছোটো বৈঠা বেয়ে। চাড়ি চালাবার কায়দা আলাদা। নৌকোর মতো বৈঠা বাইলে উল্টে যাবে। চাড়ির গা ঘেঁষে গোল করে করে জল কাটতে হয়, চাড়ি কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগিয়ে চলে।

চাড়িতে বিপদও আছে আবার। একবার যদি উল্টে যায় জলে তবে মানুষটাও পড়বে চাপা। বেরিয়ে আসা মুশকিল তখন।

ছোটোমামা এইরকম একদিন দুম করে বেরিয়ে পড়লেন জলে চাড়ি ভাসিয়ে। কোথায় যান কেন যান কোনোদিনও বলে যান না, আজও না। পরে জানলাম— কোথায় কোন্ ঝিকাগাছে একটা মৌচাক দেখেছেন, সেটা ভাঙতে গেছেন।

ছোটোমামা মৌচাকটা খুঁচিয়ে ভাঙবেন, চাড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছেন; জলের উপর চাড়িটা টলমল করছে, পা টলছে, হাতের বাঁশটাও টলছে সেই সঙ্গে। মৌমাছির ঝাঁক গেল খেপে। খেপা মৌমাছির তাড়া বড়ো ভয়ংকর। মামা মৌমাছির তাড়া খেয়ে হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে পড়লেন চাড়ি উল্টে জলে।

ঝোপঝাড়-ডোবা জল ছিল সেখানটায়, তাই রক্ষা। তলিয়ে গেলেন না। ঝোপজঙ্গল আঁকড়ে মুখটা কোনোমতে তুলে চিৎকার করতে লাগলেন তারস্বরে।

ভাগ্যিস পড়েছিলেন দত্তের বাড়ির পিছন দিকে। তারা শুনতে পেয়ে হৈ হৈ করে লোকজন ডেকে কেউ ভেলা ভাসিয়ে, কেউ নৌকো নিয়ে গিয়ে ছোটোমামাকে তুলে এনে পৌঁছে দিলেন বাড়িতে।

দিদিমা কথা বলতে পারছেন না— কী ঘটতে পারত আজ— এই আতঙ্কে।

মা খুব বকলেন ছোটোমামাকে। অন্য মামারা রাগারাগি করলেন।

মামীরা প্রথমে থ' হয়ে রইলেন, সব-কিছু ঠাণ্ডা হবার পর ছোটোমামার উদ্দেশে মুখ টিপে হাসলেন। ভাবখানা যে, এবারে কর্তা জব্দ, আর বের হবেন চাড়ি করে জলে?

ছোটোমামা মুখ গোমড়া করে পুবের ঘরে ঢুকে খাটে শুয়ে রইলেন।

ঠিক এর দুদিন পরে মামাদের অলক্ষ্যে 'কার' হাতে একটা নতুন চাড়ি নামিয়ে জলে ভাসিয়ে তাতে চড়ে বসলেন ছোটোমামা। মামীরা এবারে তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই বললেন কথাটা, বললেন—'বেহায়া'।

ছোটোমামার কানে কথাটা গেল কি না বোঝা গেল না, দু হাতে জল কেটে কেটে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন ততক্ষণে।

১৩

মা'র বাপের বাড়ির সাদামাটির উঠোনটি দিনে রাতে চিক্‌চিক্ করে। —যেন জলভরা দিঘিটা আলোয় হাওয়ায় কাঁপে।

সারাদিনের সংসার এই উঠোনের উপরে। —যেন রাতের তুলে-রাখা ধামাভরা সংসারটা এনে উপুড় করে ফেলা হয় রোজ সকালে এইখানে।

যেদিন যে কাজটা হয় সেটাই একটা পর্ব। ছাতু কোটা হচ্ছে তো এদিন এই কাজটাই প্রধান। বাড়ির মেয়েদের ভিড় এই ছাতুকোটা ঘিরে।

যেদিন চিঁড়ে কোটা হয়— সে তোড়জোড় আবার আলাদা। উঠোনে 'দো-আখা' পাতা, দুমুখে আগুন ওঠে একই জ্বালানি থেকে। দুজন বসে যায় উনুনের ধারে ভিজিয়ে-রাখা ধান খোলায় করে ভাজতে। ধানগুলি পুরপুর করে ফুটে-ওঠা-ওঠা হয়, সঙ্গে সঙ্গে এনে ঢেলে দেয় 'হামাইল দিস্তায়'। আর দুজন তৈরি হয়েই থাকে ছিয়া হাতে নিয়ে, দুম্‌দুম্ 'পাড়' দিতে থাকে দু দিকে দাঁড়িয়ে।

ধান গরম থাকতে থাকতেই তাকে পিটিয়ে চ্যাপ্টা করতে হয়, তবেই চিঁড়ে হয়।

কখনো তিন জনে মিলেও চিঁড়ে কোটে। তিন ছিয়ায় 'পাড়' পড়ে— এক দুই তিন, এক দুই তিন।

আমরা ছোটো ছোটো বেতের ডালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। চিঁড়েটা তৈরি হবার কালে মাঝামাঝি একটা সময়ে জট পাকিয়ে ডেলা মতো হয়— সেই ডেলা খাব মনে আশা।

ছিয়ার পাড় থামে না— চলতেই থাকে এক দুই, এক দুই— এক দুই তিন, এক দুই তিন। এক মামী তারই মধ্যে পলকের ফাঁকে হাত গলিয়ে আমাদের চিঁড়ে তুলে দেন।

আশ্চর্য, হাতে লাগে না 'পাড়'— লাগলে তো সাংঘাতিক, থেঁতলে যাবে আঙুলগুলি চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে। জালাভরা চিঁড়ে হয় চিঁড়ে কোটার দিনে। গরম চিঁড়ের স্বাদ-গন্ধই আলাদা।

মুড়ি ভাজা হয়। 'দো-আখা'য় আগুন দাউ দাউ জ্বলে। মুখখোলা বড়ো একটা মাটির হাঁড়িতে বালি গরম হতে থাকে একটাতে, অন্যটাতে হতে থাকে মুড়ির চালভাজা— নুনজলের ছিটে দিয়ে দিয়ে। খড়কে কাঠির গোছা নেড়ে যে চাল ভাজছে সে ভাজছেই। হাত থামে না তার। ডান হাত বাঁ হাত পাল্টে নেয় খানিক— হাতে ব্যথা ধরলে। চাল ভাজা ঠিকমতো না হলে মুড়ির গড়নটা ফুলবে না ঠিকমতো।

দিদিমা তালপাতার ডাঁট দিয়ে হাঁড়ির গরম বালিটা নেড়ে নেড়ে দেখেন— তাত্‌লো কতখানি। বালির গরমের এদিক ওদিক হলেই গেল, হয় মুড়ি চাল-চাল থাকবে, নয় মুড়ি পুড়ে পুড়ে উঠবে। তালকাঠির ডাঁটটা বালির গরমে পোড়া পোড়া হবে; কিন্তু ধোঁয়া উঠবে না— এটাই হল ঠিক তাপ। এই তাপে ভাজা চাল ছেড়ে দু হাতে হাঁড়ি শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে এক এক হাঁড়ি মুড়ি ভেজে ফেলে এক-এক বারে।

চাড়ির মতো বড়ো মাটির ঝাঁঝরি থেকে সেই মুড়ি সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের চালুনিতে ঢেলে নির্বালি নিটোল মুড়িগুলি টিনের মট্‌কিতে ঢেলে রাখেন মামীরা। গরম বালির হাঁড়ি আবার চড়ে উনুনে, আবার একখোলা চাল নিয়ে ভাজতে বসে যায় একজনে। সারাদিন চলে মুড়ি ভাজা। মুক্তোর নোলকের মতো মুড়িগুলি হয় যে খোলায়, ভাজিয়েরা, দেখিয়েরা খুশি হয়ে ওঠে দেখে।

আমরা এ দিন গরম মুড়ি খেয়েই কাটিয়ে দিই। ভাত আর খাই না। খাবার প্রবৃত্তি হয় না। এক এক খোলা মুড়ি ভাজা হয়, আর আমরা মাল্‌সার মতো যার যার বেতের ডালাটি হাতে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

গোটা বেত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তৈরি এই ডালাকে বলি 'হাজি', মানে সাজি। মুড়ি চিড়া খই এই নিশ্ছিদ্র সাজিতে করেই খাই।

কত সাজি মুড়ি যে খেয়ে উঠি— কাসুন্দি মেখে খাই, তেল নুন লঙ্কা মেখে খাই, ঘন জ্বাল দেওয়া রস দিয়ে খাই, মুলো ছেঁচে তাই দিয়ে খাই, ক্ষেতের কচি মটরশুঁটি দিয়ে খাই, মুড়ি ভাজার দিনে যখন যে জিনিসের সময় থাকে তাই দিয়েই খাই।

মুড়ি তো রোজই খাই; কিন্তু টাট্‌কা ভাজা মুড়ি— এর স্বাদ অপূর্ব!

মাসে মাসে যেমন পাল-পার্বণ ব্রত-উপবাসের পর্ব তেমনি এই উঠোনের ধারে 'দো-আখা' উনুন ঘিরে পর্ব।

শীতকালে খেজুর রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি হয় সম্বৎসরের। মাটির কলসি কলসি ভাগের রস রেখে যায় 'গাছি-ভাই' ভোরবেলা উঠোনের ধারে। খেজুর গাছ কাটা থেকে, হাঁড়ি বাঁধা, হাঁড়ি নামানো সব কাজ গাছির; রস অর্ধেক গৃহস্থের, অর্ধেক তার।

রসের দিনে প্রতিদিন ভোরে এই দো-আখা জ্বলে। বড়ো বড়ো দুটো লোহার কড়াইতে রস জ্বাল হয়। পালা করে একজন সারাক্ষণ বসে থাকে 'আখা'র ধারে; শুকনো পাতা, তুষ, নাড়া, কাঠ অবিরত ঠেলে দেয় উনুনে। বহুক্ষণ লাগে জলের মতো স্বচ্ছ রসে রঙ ধরাতে।

জ্বাল হতে হতে যখন এই রস লাল হয়ে ওঠে মামীরা বসে যান নারকেল আর কুরুনী নিয়ে। একটা নয়, দুটো নয়, পর পর নারকেল ফাটান আর কুরিয়ে বারকোশ ভরেন।

রসটা আরো ঘন হয়ে ওঠে। মামীরা নারকেল কোরা রসে ফেলে ঘুঁটতে থাকেন। এক পাশে সারি সারি গোল চৌকো ছোটো বড়ো নানা আকারের মাটির ছাঁচ পাতা; পাতলা কাপড়ে ঢাকা— কাপড় থেকে ছাঁচের গুড় তুলতে সুবিধে— আটকে যায় না ছাঁচে।

রসে গুড়ের পাক ধরল; দিদিমা নারকেলমালার হাতায় করে গরম ঘন রস ছাঁচে ছাঁচে ফেলে চললেন। একদিক দিয়ে ফেলা হয়, আর-দিকে সেই রস ছাঁচে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট গুড় হয়ে যায়। মা-মামীরা চট্‌পট্ গুড়গুলি তুলে আবার নতুন করে ছাঁচ পেতে দেন।

সোনার মতো রঙ হওয়া চাই গুড়ের। নইলে মন খারাপ হয়ে যায় দিদিমার। রসের দিনে বড়ো ব্যস্ত তিনি। সূর্য ওঠার আগে রসে জ্বাল ওঠা চাই। একটু বেলা হল কি— গুড় লাল হয়ে গেল।

এই গুড়েরও কত রকমফের। রসে ক্ষীর মিশিয়ে যে গুড় হয়— তা ক্ষীর-পাটালি। এলাচ কর্পূর দিয়েও পোশাকি গুড়। নারকেল মিশিয়ে হয় নারকেলি গুড়। আর— মুছিগুড়— বড়ো বড়ো মুছিতে শুধু রস ঢেলে ডেলা ডেলা গুড় করে রাখা হয় পিঠে পায়েস এই-সব মোটা কাজের জন্য।

মুড়ির ভিতরে ভিতরে গুড়গুলি রেখে দেন দিদিমা মাটির মট্‌কি ভরে কারের উপরে। এইভাবে গুড় থাকলে সারাবছর শক্ত থাকে, নরম হয় না, গলে যায়

না। মট্‌কির মুড়িটা অবশ্য মিইয়ে যায়; মাঝে মাঝে দিদিমা এই মুড়ি বদলে দেন। মুচমুচে মুড়িতেই ভালো থাকে গুড়।

অক্ষয় তৃতীয়া আর-এক পর্ব। এই একটি দিন— কাসুন্দি করার দিন। সারা গ্রামে ঘরে ঘরে এক বিশেষ ব্যাপার।

সকালবেলা দিদিমা মামীরা গ্রামের গিন্নিরা বউ মেয়েরা সবাই চললেন গাঙে সরষে ধুতে। ইছামতীকেই বলা হয় গাঙ। আগে শুচিস্নাত হয়ে নিতে হয়। গাঙের জলে ডুব দিয়ে, বুকজলে দাঁড়িয়ে সরষে ধোন সকলে। বড়ো বড়ো জোলার বোনা নতুন গামছায় সরষে রেখে দুদিকে দুজনে ধরে গামছাখানা নাড়েন স্রোতের জলে। ধুলো বালি সব ধুয়ে যায় সরষের।

উলুধ্বনি পড়ে।

ধান দূর্বা কয়েকটা হলদির টুকরো থাকে সরষের সঙ্গে। কাসুন্দি করাও শুভ কাজ একটা। সকলে করতে পারে না, 'আইস্য' লাগে— মানে এ কাজ করার অধিকার থাকা চাই। নানা বিধি-নিয়ম আছে নানা কাজের, কাসুন্দি করাতেও। মা পারেন না কাসুন্দি করতে। অধিকার নেই। কবে কোন্ একবার এই কাসুন্দি করার কালে কী এক দুর্ঘটনা ঘটেছিল পরিবারে, সেই অবধি বংশে কাসুন্দি করা নিষেধ হয়ে আছে।

যারা সরষে ধোন, ঢেঁকিতে কোটেন, কাসুন্দি তৈরি করেন, তাঁরা কেউ আজ তেতো, টক খান না। শুদ্ধভাবে শুদ্ধ মনে করেন এ কাজ।

গামছায় বাঁধা ধোওয়া-সরষে আর কলসিভরা স্রোতের জল নিয়ে বাড়ি আসেন সকলে। উঠোনের রোদে মেলে দেন সরষে। এই সরষে শুকনো হলে ঢেঁকিতে কোটা হয় ছাতুর মতো মিহি করে। ওদিকে নতুন মাটির হাঁড়িতে গাঙ হতে আনা জল ফোটে উনুনে। ফুটতে ফুটতে ভরা হাঁড়ির জল যখন আধ হাঁড়ি হয়, দিদিমা কুলোয় করে গুঁড়ো সরষে এনে ফেলে দেন জলে। সরা দিয়ে মুখ বন্ধ করেন হাঁড়ির।

এর পর উলু দিতে দিতে কাসুন্দির হাঁড়ি এনে তোলেন দক্ষিণের ঘরে।

ততক্ষণে সন্ধে।

সকাল হতে ঘরে ঘরে 'উলু' পড়ে, সরষে ধোওয়া থেকে কাসুন্দির হাঁড়ি ঘরে তোলা অবধি।

পর পর কয়দিন উঠোনের মাঝখানে গোবরলেপা জায়গায় কাসুন্দির হাঁড়ি এনে রোদে দেন দিদিমা। স্নান করে শুচিবাস পরে তবে ছোঁন কাসুন্দির হাঁড়ি।

কাসুন্দির হাঁড়ি ছোঁওয়ারও নিয়ম অনেক। দিদিমা বলেন, যেমন তেমন করে ছুঁলে কাসুন্দি থাকে না সারা বছর, খারাপ হয়ে যায়।

সারা বছরের কাসুন্দি একবার খারাপ হয়ে গেলেই হল। আবার আর-এক অক্ষয় তৃতীয়ার অপেক্ষা।

কয়দিন রোদ পাবার পর কাসুন্দি ভালোভাবে তৈরি হয়ে যায়। দিদিমা শিশিতে বোতলে কাসুন্দি ঢেলে সারি সারি শিকার ঝুলিয়ে রাখেন। বোতলের কাসুন্দিগুলি রইল দূরে যারা আছে তাদের জনে জনের নামে। আর হাঁড়ির কাসুন্দি খরচ হতে থাকবে চল্‌তি সংসারে।

আমরা প্রথম দিনেই একটু 'সাজো কাসুন্দি' খাবার জন্য হাত পাতি, দিদিমা একটু একটু চাখতে দেন। নতুন কাসুন্দি তিত্‌কুটি লাগে। দিদিমা নিষেধ করেন— 'বলে না ও কথা; বল্‌—মধু—মধু'।

দিদিমার হাতের কাসুন্দি প্রসিদ্ধ। গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে ভালো কাসুন্দি হয় দিদিমার হাতে, খুব ঝাঁঝ্‌ ওঠে কাসুন্দিতে। আমসত্ত্বের দিনে উঠোন ছেয়ে আমসত্ত্বের ছাঁচ পড়ে; ছোটো বড়ো কত রকমের পাথরের ছাঁচ। তাতে কুলোয় না; কাঁসারি রেকাবি বগি-থালাগুলিও পড়ে। আর এ-সব ছাড়া পড়ে পাটি, চাটাই, চিক্‌নাই— উঠোন জুড়ে।

শৌখিন আমসত্ত্বগুলি ওঠে ছাঁচে। ছাঁচের আমসত্ত্ব মা নিজে দেন। অন্য কারো হাতে ছাড়েন না। পাথরের খাদা ভরা ভরা আমের গোলা করেন মিহি কাপড়ে ছেঁকে। কোনো গোলায় ক্ষীর চিনি মেশান, কোনো গোলায় শুধু চিনি। সোনার বর্ণ আমগুলি মা আগে বেছে নেন; ঝড়তি-পড়তিগুলি থাকে দিদিমার ভাগে।

দিদিমার হল ঢালা কাজ। থালায় থালায় গোলা ঢেলে দিলেন, আরো রইল— পাটিতে ঢাললেন। আমের-খোসা চাঁছা পদার্থটা চাটাই চিক্‌নাইতে ঢেলে ঘর লেপার মতো হাত দিয়ে লেপে দিলেন; মোটা আমসত্ত্ব হয়— তা হোক। বর্ষাকালে টক্‌ রেঁধে খাবে বউরা। তখন এই খোসা-চাঁছা আমসত্ত্বই কত মধুর লাগবে। আমসত্ত্বের দিনে আমসত্ত্ব নিয়েই মেতে থাকেন দিদিমা মা মামীরা উঠোনে।

উঠোন ভরে খই-এর ধান শুকোয় লক্ষ্মীপূজার আগে। উঠোনের রোদে তাপ পায় তেঁতুল বড়ই চালতা কাঁচা আমের আচারের হাঁড়ি। তাপ পায় সম্বৎসর কাঁথা কাপড় লেপ তোশক।

বাজারের সওদা এনে ঢালে উঠোনে ছড়িয়ে। আগন্তুক কেউ এসে উঠোনে দাঁড়িয়েই হাঁক দেয় গৃহস্থের নাম ধরে।

এই উঠোনের ধারে সদ্য-তোলা আঁতুড় ঘরে কেঁদে ওঠে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে।

এই উঠোনে এসে প্রথম দাঁড়ায় পুত্ররা বিবাহ করে নববধূ সঙ্গে নিয়ে। ঘিয়ের প্রদীপ হাতে বধূবরণ করে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে তোলেন এই উঠোন পেরিয়ে।

শনির পূজা, নারায়ণ সেবা, হরির লুট, বারব্রত— সব-কিছুর ভিড়ই উঠোনে। এই উঠোনেই একদিন দিদিমা আছড়ে পড়লেন— 'ওরে আমার প্রিয় রে' বলে।

সেজোমামা প্রিয়নাথ— কাজ করেন আসানসোলে। 'টেলিগ্রাম' এল তিনি অসুস্থ। খুব মারাত্মক রকমের ব্যাপার না হলে দেশে গ্রামে এ ধরনের খবর সহসা আসে না। সেইদিনই ফুলমামাকে দিয়ে সেজোমামীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেখানে।

দিন দিন, ছয় দিন হয়ে গেল, খবর আসে না কোনো। দূরের পথ, ডাকের চিঠিও আসতে যেতে সময় নেয় অনেকটা। দিদিমা যখন-তখনই ঘাট্‌লায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘাট্‌লা থেকে সিদ্ধেশ্বরীতলার ওদিকটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ঐ দিকেই 'ভাগ্যকুলে'র স্টিমার ধরবার পথ।

এ দিনও দিদিমা দাঁড়িয়ে আছেন ঘাট্‌লায় পথের দিকে চেয়ে। দূরে— অতি দূরে কী যেন আসছে দেখলেন। দেখলেন একটা 'ডুলি' আসছে। দিদিমা কী বুঝলেন— একরকম ছুটে এসে উঠোনে লুটিয়ে পড়লেন।

খানিক পরে 'ডুলি' এসে থামল তুলসীমণ্ডপে। সেজোমামী নামলেন ডুলি হতে— পরনে সাদা থান ধুতি। গিয়ে আর দেখতে পান নি সেজোমামাকে।

১৪

মেজদা সেজদা দুই দাদা পড়তে চলে গেলেন শান্তিনিকেতনে। মা ঢাকার বাস তুলে দিলেন। আমাদের দু'বোন আর ছোটো ভাইটিকে নিয়ে চলে এলেন বাপের বাড়িতে।

সঙ্গে এল দু নৌকো বোঝাই মাল। বাবার তৈরি কাঠের ভারী ভারী আসবাবপত্র, বিরাট দুটি পালঙ্ক, বড়ো বড়ো ট্রাঙ্ক, সিন্দুক— বাবার স্মৃতি-বিজড়িত কোনো কিছু ফেলে এলেন না মা পিছনে।

এই-সব ট্রাঙ্ক খুলে মা বছরে দু'বার রোদ দেখান জিনিসপত্রে। একবার বর্ষার শেষে, একবার শীতের মুখে।

বাবার গরম কাপড়গুলি মা রোদে একটু গরম করে আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝেড়ে ভাঁজ করে তুলে রাখেন শুকনো নিমপাতা ছড়িয়ে। বাবার বইখাতা কাগজপত্রগুলি খুলে খুলে মেলে দেন উঠোনে। এইগুলি রোদে থাকে বেশিক্ষণের জন্য।

এই দিনে উৎসাহের অন্ত থাকে না আমাদের।

কত ট্রাঙ্ক খোলা হয়, কত কিছু রোদে পড়ে। বই, কাগজই বেশি। এই একটি দিন আমরা বাবার হাতে-লেখা পাণ্ডুলিপি, কবিতার খাতা উল্টেপাল্টে দেখতে পাই।

বেশির ভাগ লেখাই 'কপিন কালি' দিয়ে।

ট্রাঙ্ক খুলে মা রোদে দেন গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি, পোস্টকার্ড; রঙে চাইনিজ ইঙ্ক-এ একপিঠে স্কেচ, একপিঠে লেখা। রোদে দেন বাবাকে লেখা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের চিঠি, মাকে বড়দাকে লেখা এন্ডরুজ, পিয়ার্সন সাহেবের চিঠি। পিয়ার্সন সাহেব বাংলা জানতেন— মাকে বাংলাতেই চিঠি লিখতেন। এক চিঠিতে সম্বোধনে 'মাতা ঠাকুরানী' লিখতে লিখেছেন 'মাথা ঠাকুরানী'। এইটেতে আমরা খুব আমোদ পাই, বারে বারে পিয়ার্সন সাহেবের চিঠিখানি নিয়ে পড়ি আর খিল খিল করে হাসি।

বই-এর স্তূপ পড়ে রোদে। পুরাতন বিদেশী শিল্পীদেরও কত ছবির বই। ডুরার, রেমব্রান্ট, ডা ভিঞ্চি— ওঁদের সব ছবির বইগুলির পাতা উল্টেপাল্টে দেখি আর বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হই। এই ছবিগুলির জন্য এক তীব্র আকর্ষণ থাকে মনে। বড়দার ছবি, স্কেচও এক বোঝা; ছোটো বড়ো, পুরু পাতলা, টুকরো ছেঁড়া নানা সাইজের কাগজে কালি রঙ পেন্সিল দিয়ে আঁকা। এও পড়ে রোদে।

আধখানা উঠোন ভরে যায় বইয়ে, কাগজে। এর একটি কাগজ এদিক ওদিক হয় না, বা হাওয়ায় উড়ে যায় না কখনো। মা নিজে পাহারা দেন।

আচার-আমসত্ত্বের দিনে যেমন কাক শালিখ তাড়াবার জন্য কঞ্চি হাতে আমাদের বসিয়ে রাখেন কাছে, এ দিন আর তা করেন না। তবে মা আমাদের সাহায্য নেন এগুলি বের করতে, তুলে রাখতে। তখনই এ-সব হাতে ছুঁতে পাই, একটি একটি করে দেখি।

বছরের এই দুটি দিনের অপেক্ষায় আমরা থাকি দু বোন।

এই ছবি দেখার শখ থেকেই শখ জাগে মনে ; নিরালা দুপুরে 'প্রবাসী'র পাতা খুলে ছবি দেখে দেখে পেন্সিল ড্রইং করি। লুকিয়ে করি।

বড়ো দিনের বিকেলবেলায় মা মহাভারত রামায়ণ পড়েন।

রান্নাঘরের পিছনের আমগাছ দুটো সকলের আগে পশ্চিম আকাশের ছায়া ফেলে উঠোনে। এই ছায়ায় একখানা জলচৌকির উপর মহাভারতখানা নিয়ে মা বসেন। এ পাড়ার ও পাড়ার বৃদ্ধ-বৃদ্ধা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া শূদ্র-নমঃশূদ্র— এঁরা অনেকে এসে বসেন ঘিরে। মা সুর করে পড়েন এরা শোনেন।

নিয়মিত আসেন সবাই। রামায়ণ-মহাভারতের পুণ্যকথা যত শোনা যায় তত পুণ্যি। শুনতে শুরু করে বাদ দিতে নেই, অপরাধ হয় নাকি।

খালি হাতে শুনতে হয় না পুণ্যকথা। গাঁদাটা অতসীটা— হাতের কাছে যে যা পান ছিঁড়ে হাতে নেন।

আমারও খুব ভালো লাগে শুনতে। চোখে দেখে পড়ার চেয়ে এইরকম সুরে সুরে কথাগুলি যখন কানে আসে, তা যেন বেশি সরস লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ছবি সব চোখে ভেসে ওঠে। আমি একপাশে বসে শুনি। কখনো কখনো মা আমাকে পড়তে দিয়ে জলটা, দোক্তাটা খান। আমার প্রাণ খুশিতে উপ্‌চে ওঠে। মার কাছেই শিখেছি পড়ার সুর। খুব মন ঢেলে পড়ি।

এই মহাভারত কি রামায়ণ যেদিন পড়া শেষ হয় সেদিন বিশেষভাবে হরির লুট দেওয়া হয়। একবার সেই জেলে দু'ভাইকে আনানো হল। উঠোন ছাপিয়ে লোক। অনেকক্ষণ ধরে অনেক গান হল, খোল করতাল বাজল। ধামা ভরা বাতাসার 'লুট' হল।

হরির লুটের শেষে গান যখন হয় তখন ছেলেবুড়োর দল সব নেমে পড়ে আসরে, দু হাত তুলে নাচে আর গায়—

'চৌদিকে খোল করতাল বাজে, মধ্যে নাচে গোরা।
লাগলো হরি লুটের বাহার, লুটে নে গো তোরা।'

ধামাভরা বাতাসা মুঠো মুঠো ছিটিয়ে দিতে থাকে একজন মাথার উপর দিয়ে আসরে। হরির লুটের নিয়ম এই।

এই প্রসাদী বাতাসা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে। হাসি, উল্লাসে হরির লুট সমাপন হয়। এ এক সহজ সরল নির্ভেজাল আনন্দ সকলের।

এই রামায়ণ-মহাভারত শুনতে ও পাড়া থেকে বোসের বাড়ির খুড়িও আসেন। এসে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনেন। খরার দিনে তিনি 'সূর্যব্রত' নেন। সূর্য উদয় হতে অস্ত পর্যন্ত নির্জলা উপবাসী হয়ে পায়ের উপরে থাকা নিয়ম। সারাদিন ঘরে আর কত চলাচল করবেন, সময় যখন কাটে না আর, তখন খুড়ি পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে বের হন।

নয়াবাড়ির যশোদী বইনও এই ব্রত করেন। তাঁর ব্রত আরো কড়া নিয়মের। উঠোনে গণ্ডি টেনে সেই গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন উদয় অস্ত।

যশোদী বইন— তাঁর মেয়ে পারুলী— দুই মা মেয়ে যেন রূপের খনি। পারুলীকে কোলে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হন যশোদী বইন, এখনো বয়স তেমন না। হাসিখুশি মানুষ। বারব্রত নিয়ম উপবাস নিয়ে থাকেন বারোমাস।

গ্রামে ছেলেদের মেয়েদের যত সুন্দর নামই থাকুক-না কেন ঠিক ঠিক উচ্চারণে ডাকে না কেউ। আকার ইকার দিয়ে নামটা লম্বা করে ডাকে। পারুলকে ডাকে পারুলী, যশোদাকে যশোদী, কুসুমকে কুস্‌মী, মকরবালাকে মাকোড়ী, শৈলকে শৈলী।

এমনিতরো ছেলেদের বেলায় পরেশ হয় পরেইশ্যা, হারান— হারাইন্যা, মুকুল— মুকুইল্যা, কচি— কইচ্যা, কালী— কাইল্যা, যতীন— যতীনা।

যশোদী বইন মন্ত্র নিয়েছেন গুরুর কাছ থেকে। প্রতিবছর আসেন গুরু। গুরু গাইয়ে; অতি সুন্দর পালাকীর্তন করেন। এই গুরু একবার গ্রামে এলে মাসখানেক থাকেন, অর্থাৎ তাঁকে থেকে যেতে হয়। প্রায় প্রতি বাড়ি থেকেই আহ্বান আসে। এক-এক রাত্রে এক-এক বাড়িতে তিনি কীর্তন গান। মাথুর, নৌবিহার, বাল্যলীলা— কৃষ্ণের সকল লীলার এক-এক পালা হয় এক-এক বাড়িতে। গ্রামের সবাই সে সন্ধ্যায় সে বাড়িতে জমায়েত হন— গান শোনেন।

আরো একটা আকর্ষণ আছে গুরুর, গুরুর সঙ্গে আসেন এক ব্রাহ্মণ পাচক-শিষ্য, রান্নাবান্না তিনি-ই করেন। চমৎকার রান্নার হাত। গ্রামের ঘরে ঘরে ডাক পড়ে গুরুর— ভোগ নিতে। পাচক-শিষ্যই রান্না করেন সব জায়গাতে।

বড়ো বড়ো পিতলের গামলা ভর্তি ডাল তরকারি টক পায়েস হয়। পাড়া প্রতিবেশীর নিমন্ত্রণ থাকে। খাওয়া সেরে এদিন উঠতে উঠতে বিকেল গড়িয়ে আসে।

এই একমাস দেখতে দেখতে কেটে যায় বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে আর পালাকীর্তন শুনে।

উঠোনে ঘুরে ঘুরে দিদিমা তাকিয়ে দেখেন গাছের মাথা। গোপালভোগ আমগাছের মাথায় একদিন দেখা দেয় 'বোল'। সবার আগে এই গাছটায় আগে ধরে ফুল।

দেখতে দেখতে কয়েক দিনের মধ্যে 'বোল'-এ ছেয়ে যায় সব আমগাছ। যত 'খুয়া' পড়ে তত 'বোল' ধরে গাছে। 'আমের বোল', কাঁঠালের 'মুছি'র সৌরভে

ভুরভুর করে আঙিনা। মাদার ফোটে, পলাশ ফোটে, শিমুল কাঞ্চন মালতী ফোটে। আর ফোটে প্রতি সন্ধ্যায় নন্দদুলাল ফুল ঘরের দাওয়া আলো করে। ফুলের উৎসব উপরে নীচে।

নন্দদুলাল অবশ্য বারো মাসই ফোটে। যখন এখনকার এরা কেউ থাকে না ধারে কাছে তখনো ফোটে। আপন মনে এরা ফোটে, হাসে, রঙে ভরে তোলে জায়গা।

সব ঘরের সামনে 'ওটা'র দু পাশে নন্দদুলালের ঝাড়। একবার দিদিমা লাগিয়েছিলেন এদের, তার পর থেকে এরা নিজেরাই নিজেদের দেখে। এক গাছ মরে যায়, মাটিতে ঝরা বীজ থেকে আবার এক গাছ মাথা তোলে।

কত রঙবেরঙের নন্দদুলাল ফুল— হলুদ কমলা, লাল গোলাপি সাদা, বাসন্তী মেজেন্টা— আবার রঙে রঙে মিলেমিশে ছোপছাপ, ছিটেফোঁটা, রেখা টানা— কত রকমের। কী রঙের বাহার! সরু কাঠির মতো খানিকটা লম্বা হয়ে উঠে মাথার কাছে এসে হঠাৎ গোল হয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নিজেকে। জোড়া পাপড়ি ফুল— ছাতার মতো। কোমল ফুল।

ভোরবেলা এই ফুল তুলে বিনুনী গেঁথে বিনি-সুতোয় মালা গাঁথি, গেঁথে ফুলের সাজিতে রেখে দিই। মা পুজো করতে বসে দেবদেবীর ফোটোর উপরে সাজিয়ে দেন মালা, বাবার ফোটোতেও পরান একটি।

বারোমাসী ফুল আছে আরো— 'নয়নতারা'। ঘাটের পারে পথের ধারে, যত হেলাফেলার স্থানে ফুটে থাকে এরা। মান-অপমান বোধ নেই। হাসিমুখে ফোটে। আর গৃহস্থদের আঙিনা পেলে তো কথাই নেই, আহ্লাদে যেন গলে পড়ে সাদা, গোলাপি নয়নতারাগুলি।

এর বীজ গোটাগুলি ইঞ্চিখানেক লম্বা সরু সরু কাঠির মতো। সবুজ গোটা শুকিয়ে ঘন বাদামী রঙ ধরে। আমরা এই শুকনো বীজগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে রেখে মুখ বন্ধ করি। জলীয় বাষ্প পেয়ে বীজগুলি ফট্‌ফট্‌ করে ফোটে মুখের ভিতরে। ভারি মজা লাগে। এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট চেপে হাসি, কার মুখে কতবার ফুটল— কান পাতি। নানা খেলার ফাঁকে ফাঁকে এটাও একটা খেলা আমাদের।

সরস্বতী পুজো এসে পড়ে। শিউলি ফুলের বোঁটা দিয়ে বাসন্তী রঙে শাড়ি ছোপানোর ধূম পড়ে যায় ছেলেমেয়ে সকলের। বাসন্তী রঙের শাড়ি ধুতি পরা নিয়ম শ্রীপঞ্চমীতে।

শিউলি ফুলের শুকনো বোঁটা মুঠো মুঠো দিয়ে জল ফুটিয়ে সেই জলে শাড়ি ডোবাই, ঝিঙেফুলের মতো হেসে ওঠে শাড়িখানা। এমন সুন্দর উজ্জ্বল বাসন্তী রঙ আর হয় না কিছুতে।

সরস্বতী পূজার দিন সাত-সকালে স্নান করে আগে তাড়াতাড়ি বাসন্তী রঙের শাড়িখানা পরি। টপ্‌টপ্‌ করে ভিজে চুল হতে জল পড়ে পিঠে— মুছবার অবসর নেই। সরস্বতী পূজার আয়োজনে লেগে যাই।

সরস্বতী পূজায় পলাশ ফুল চাই-ই চাই। ছোটোমামা বন থেকে পলাশের ডাল ভেঙে এনে ঘরে ফেলেন। পঞ্চশস্য আজ দিতে হয় দেবতার দোরে। আমের মুকুল, গমের শীষ, ধানের ছড়া, কাঁচা সরষে, আমড়ার বোল— এক গোছা এনে রাখি ঘটের সামনে। ঘটের মুখে মুকুল-সমেত একটি 'আমসরা' দিই। আজ আমসরার পুরন্ত মুকুলটি দেখতে লাগে যেন ছোটোখাটো মন্দির একটি।

বইখাতা যার যা আছে, সব সাজিয়ে দিই সরস্বতীর উদ্দেশে 'ঘট' রাখা জলচৌকিখানার উপরে। আজ লিখতে নেই, পড়তে নেই। মনের ভুলে আঙুল দিয়ে যদি দাগ কেটে ফেলি মাটিতে, তাড়াতাড়ি আঙুল দাঁতে কামড়ে ধরি। দোষ কাটাই।

আজ ঘরে ঘরে জোড়া ইলিশ আসে। মামীরা জোড়া ইলিশের কপালে সিঁদুর পরিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে বাজার থেকে আনা মাছ ঘরে তোলেন। কচি, বাচ্চা মাছ। আজকের দিনের মাছ ভাজতে নেই, সাঁতলাতে নেই। 'একছাইয়া' করে কেটে ফোটানো হলুদজলে মাছ ছেড়ে পাতলা ঝোল রাঁধতে হয় এ ইলিশের।

বিজয়া দশমীর পর ইলিশ খাওয়া নিষেধ কয়মাস। এই আবার নতুন করে শুরু হল খাওয়া।

ঝুরঝুর ঝুরঝুর— আমগাছতলায় বোলের ফুল কত শুকিয়ে পড়ে মাটিতে, মাছি মৌমাছি কত ভিড় করে গাছে গাছে। বোলের মধু কত ঝরে পড়ে, ঘনসবুজ চওড়া আমপাতাগুলি চিক্‌চিক্‌ করে সে মধু সেচনে।

তার পর একদিন আমে 'গুটি' ধরে।

এ বছর হাওয়াটা দিদিমার কেমন-কেমন ঠেকল। সাবধান হলেন সকলকে নিয়ে।

তবু কোন্‌ ফাঁকে গ্রামে জলবসন্ত চলে এল। এসে ঘরে ঘরে ঢুকল।

নিমের হাওয়া রোগ-নাশক। রোগীর বিছানার এ পাশে ও পাশে নিমের ডাল ভেঙে এনে রাখা হল। যারা ভালো আছি, দিদিমা তাদের হাতেও একটা করে নিম-ডাল ধরিয়ে দিলেন। আমরা চলি ফিরি, হাতের ডাল নেড়ে নিমপাতার হাওয়া খাই।

সারা গ্রামের লোক একসঙ্গে মিলে 'শীতলা' পূজা করলেন। মা শীতলা ঠাণ্ডা থাকলে নাকি ভয় নেই এ রোগের।

বছর-আটেকের একটি কুমারী মেয়ের মাথায় কুলোর উপরে ঘটপল্লব বসিয়ে তাকে নিয়ে গিন্নিরা গান করে করে বাড়ি বাড়ি ফিরলেন। লাল শাড়ি-পরা কুলো মাথায় কচি শ্যামল কুমারীটি এসে উঠোনে দাঁড়ায়। গৃহস্থ বধূ ঘটিভরা জল ঢেলে তার পা দুখানি ধুইয়ে দেন, ঘটে পল্লবে সিঁদুর ছোঁয়ান, উলুধ্বনি দেন।

কুমারীকে নিয়ে গ্রাম ঘোরা হলে গ্রামের বাইরে এক গাছের তলায় সেই ঘট নামানো হল; মা শীতলার পূজা হল। মাকে গ্রামের বাইরে ওখানেই খুশি করে রাখা হল— গ্রামের ভিতরে যেন আর না ঢোকেন।

দুধ, ডাব, তরমুজ, শশা— সব জলীয় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ফল দিতে হয় এ পুজোয়। এই দিন গাঙে স্নান করেন সকলে। স্নানের পরে জলে দাঁড়িয়ে মা দুধ দেন গঙ্গাকে। কাঁচা দুধ এনেছেন কাঁসার ঘটিতে করে। মা গাঙের স্রোতে দুধটা ঢালেন আর দেখেন দুধটা জলের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে কি না। দুধে জলে মিলে নদীর উপরের জলটা সাদা হয়ে যাওয়া— অশুভ। দুধটা ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের টানে আপনিই নীচে তলিয়ে যায়। তবে ঢালবার কায়দা একটু আছে এতে।

এই গাঙের পারেই হারু বৈরাগীর চালাঘর। সাদা দাড়ি, টাক মাথা হারু বৈরাগী 'লাঙ্গলবন্ধে'র স্নানে গিয়ে এক অল্প বয়সের বৈষ্ণবী নিয়ে এল সেবারে। হারু বৈরাগী ভিক্ষে করতে আসে বৈষ্ণবীকে নিয়ে; মা চাটাই বিছিয়ে দেন উঠোনে, পাশাপাশি বসে দুজনে। বড়ো চুলবুলে বৈষ্ণবী, চোখ ঘাড় যেন সদাই চঞ্চল; কিন্তু অপূর্ব তার গানের গলা। বৈরাগীর হাতে থাকে একটা ডুগডুগি, আর বৈষ্ণবীর দুহাতে দুজোড়া কাঠের টুকরো— তাই বাজিয়ে গলা মিলিয়ে গায় দুজনে—

'হারাইলাম দু কূল, এ কূল আর ওই কূল
কবে ফুটবে আমার বিয়ার ফুল।'

আমরা ছোটোরা— আমরাও এসে ভিড় করে সামনে দাঁড়াই সুরের টানে। তারা গায়—

'যাব চলন করি বাঁশের দোলায় চড়ি
আট বেহারার কাঁধে চড়ি সবই হবে ভুল।
আগে পিঠে কাঠের বোঝা ছেড়ে দিয়ে ভবের মজা
শ্বশুরবাড়ি হবে আমার নদীর কূল।'

মা শোনেন আর আঁচলে চোখ মোছেন। মার অতি প্রিয় গান এটি। যতবার এরা আসে মা এই গানটি শুনতে শুনতে চোখের জলে ভাসেন।

আরো অনেক গান গেয়ে তবে ছুটি পায় বৈরাগী বৈষ্ণবী।

এবার 'লাঙ্গলবন্ধে'র স্নানে মা দিদিমা গেলেন গ্রামের দলের সঙ্গে। 'লাঙ্গলবন্ধ' তীর্থস্থান, অসংখ্য লোকের ভিড় হয় 'চৈত্-সংক্রান্তির যোগস্নানে। ভলেন্টিয়াররা বুকজলে গলাজলে দাঁড়িয়ে হাত-ধরাধরি করে ঘিরে থাকে ঘাট; তবু কত লোকের ধাক্কাধাক্কি— কত লোক চাপা পড়ে জলে। মেজদা এসেছেন ছুটিতে, এই-সব ব্যাপারে ভলেন্টিয়ারির কাজে মেজদা সর্বদা অগ্রণী। যেখানে যেমন দরকার সঙ্গে সঙ্গে নিজের একটা দল গঠন করে কাজে লেগে যান। তিনিও গেলেন মার সঙ্গে।

সাত দিন পরে মেজদা ফিরে যখন এলেন— বাড়ির পথ ধরে টলতে টলতে আসছেন, দেখে চিনতে পারে না কেউ। রুক্ষ চুল উড়ছে মাথায়, মুখের রঙ যেন আগুনে পোড়া, গায়ে ছেঁড়া শার্ট— শার্টের বুক অবধি উপরের দিকটা সাদা— নীচের দিকটা খাকি— ধুতিটা পর্যন্ত। অদ্ভুত একটা রূপ। মেজদা কথা বলতে পারেন না, গলা ভেঙে গেছে। তিন দিন তিন রাত্রি সমানে জলে দাঁড়িয়ে যাত্রী আগলেছেন দলবল নিয়ে। কাদাগোলা জলে পরনের ধুতি শার্টে ধরেছে ঐ খাকি রঙ, হিমে রোদে জলে গলার ঐ অবস্থা, অনাহার অনিদ্রায় চেতনা প্রায় লুপ্ত। মেজদা এই রকমই; যখন যেটা করেন সারা মন ঢেলে করেন; নিজের দিকে তাকান না।

মা গল্প করেন লাঙ্গলবন্ধের, কত রকমের সাধু দেখে এসেছেন সেখানে। এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে সাধু, ঊর্ধ্ববাহু সাধু, শীর্ষাসনে শূন্যে পা তুলে সাধু, এক ঠায় বসে বসে তপস্যা করতে করতে দু পা শুকিয়ে যাওয়া সাধু;—সে কত সাধুর বর্ণনা! ঘুরে ঘুরে তিনি সাধুই দেখেছেন কেবল। মার মুখে শুনে শুনে আমিও দেখি। দেখি, চারি দিকে আগুন জ্বেলে তার মাঝখানে বসে আছে সাধু— পিঙ্গল জটাজুট সে আগুনের আভায় অপরূপ। কাঠের ধোঁয়া, আগুন, ভস্ম— সব-কিছুই দেখতে পাই।

বহুলোকে স্নান করতে আসে যোগস্নানে। এই উপলক্ষে মেলা হয়। লাঙ্গলবন্ধের মেলা নামকরা মেলা।

মেলা থেকে দিদিমা আমাদের জন্য এনেছেন কাঠের পুতুল, পেঁচা, ঘোড়া। বড়ো হয়েছি; তবু মেলায় গেলে নাতনীদের জন্য খেলনা আনা— এ রেওয়াজ দিদিমার চিরকালের।

১৫

লোকে বাড়ি তুলতে ভিত্ গাঁথে মাটি কেটে, সেই 'গাড়ায়' ছোটো বড়ো পুকুর হয় গ্রামের প্রায় সবারই বাড়িতে একটা করে। সংসারের ধোওয়াধুয়ির কাজ চলে সেই জলে। অল্প বয়সের বউ-ঝিরা স্নান করে নিজ নিজ বাড়ির ঘাটে। এটা হয় বাড়ির পিছন দিকে, 'পাছদুয়ারে'র ঘাট। বাড়ির সামনে থাকে ভালো করে কাটানো পুকুর। এই পুকুর গ্রামে মাত্র চার-পাঁচটা। লোকে এই-সব পুকুরেরই জল খায়। খরার দিনে এই জলও যখন কমে যায়, টলটলে জল ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তখন খায় গাঙের জল। গাঙের জল স্রোতের জল— এ জলে দোষ কম।

বিকেল হতেই পাড়ার বউরা দল বেঁধে কলসি কাঁখে প্রৌঢ়াদের পিছনে পিছনে গাঙের ঘাটে চলেন। এই যাওয়াতে তাদের বড়ো আনন্দ। অনেকখানি পথ আপন আপন সখীদের সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতে পারেন। ঘর-সংসারে বসে এভাবে এতখানি সময় নিয়ে গল্প করবার সুযোগ মেলা ভার।

আমরা দু বোনেও যাই মামীদের সঙ্গে। দিদিমা দুটি ছোটো ছোটো পিতলের কলসি কিনে দিয়েছেন আমাদের।

গ্রামে যা-কিছু হয় সবই যেন একটা পর্ব। এই জল আনতে যাওয়াটাও একটা পর্ব।

পাশাপাশি দুজন করে লম্বা সারি দিয়ে চলেছে। তারি মধ্যে ঘোমটায় ঘোমটায় মুখোমুখি, ফিসফিস কথা হাসি, চুড়ি-বালার রুন্‌ঝুন্ যেন মাতোয়ারা মৌমাছির ঝাঁক চলেছে পথ দিয়ে।

এ বছর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল সরকার বাড়িতে।

এবারে নদীতে যাবার সময় আসে নি এখনো। কিন্তু মামাদের পুকুরের জলটা ঘোলা হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। মামীরা নন্দীদের পুকুর থেকে খাবার জল আনেন। চিনিমামীর পছন্দ 'গুণ'-এর বাড়ির পুকুরটা বেশি। পিছন দিকে হলেও স্বচ্ছ টলটলে জলে ভরা পুকুর। নির্জন পরিবেশ। গাছের ছায়ায় যেন আরো গভীর করে রেখেছে জলটাকে। কালো ছায়া ঘোলা কালো সুশীতল জল। এইজন্যই এই পুকুরের নাম 'শীতলঘাট'।

ঘাট বলতে একটা মোটা হিজলগাছ হেলে পড়েছে জলের উপরে জল ছুঁয়ে। এই হিজল গাছে বসে বউরা গামছা দিয়ে হাত পা মুখ ড'লে গামছা গাছে রেখে গাছ থেকে পা বাড়িয়ে টুপ্ করে জলে নেমে পড়েন। জলে ঢেউ তুলে তুলে কয়েকটা ডুব দিয়ে আবার গাছে ওঠেন। এদিকটায় লোকালয় কম। গাছে গাছে আড়াল করা পুকুর, নিশ্চিন্ত মনে স্নান করে মেয়েরা। দু-চার বাড়ির মেয়ে-বউ

ছাড়া এ পুকুরে আসে না বড়ো কেউ। চিনিমামীর পছন্দের আর-একটা কারণ তাই।

এদিনও এসেছেন মামী। স্নান সেরে জল নিয়ে যাবেন খাবার জন্য। তাড়া আছে, একাই চলে এসেছেন।

চিনিমামী হাতমুখ রগড়ালেন, গাছের গায়ে পা ঘষলেন, এবারে গামছাখানা রেখে জলে নেমে ডুব দিতে যাবেন— দেখেন ঘাটের কাছের জলটাতে বুরবুর করে বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে যেন। একটু থমকালেন, ব্যাপারটা কি? কাউঠ্‌ঠা কাছিম তোলে এমনিতরো বুদ্‌বুদ্‌। জলের নীচে পাঁক ঘাঁটে, পাঁকের বুদ্‌বুদ্‌ ওঠে জলের ওপরে। কিন্তু তা একটুখানি, থেকে থেকে কয়েকটা করে বুদ্‌বুদ্‌ উঠতে থাকে। দেখে বেশ বোঝা যায় যে কাউঠ্‌ঠা কাছিমের কাজ। আর— এর ধরনটা— কেমন যেন সন্দেহ হয় মামীর। ছুটে গিয়ে গুণের বাড়িতে খবর দেন।

যে যেখানে শুনলেন ছুটে এলেন, ঝুপঝাপ জলে পড়লেন, দম নিয়ে নিয়ে ডুব দিলেন। উঠলেন ডুবলেন, ডুবলেন উঠলেন— সবাই মিলে ধরাধরি করে হরিদাসকে টেনে পারে তুললেন।

জোয়ান ছেলে, গোলগাল হাসিখুশি চেহারা, ছোটোমামার বয়সী। প্রতিদিন ভোরে বড়ো একটা ফুলের সাজি আর-একটা 'কোটা' হাতে নিয়ে তার মার পূজার ফুল তুলে বেড়াতেন। আমাদের বাড়িতেও আসতেন কতদিন। আগডালের কঞ্চে করবী কোটা দিয়ে নামিয়ে নিতেন। মা কথা বলতেন, হরিদাস হেসে হেসে জবাব দিতেন, সবাই ভালোবাসতেন তাঁকে।

হরিদাসের মৃগী রোগ ছিল। বিধবা মা তাই ছেলেকে কাজকর্ম করতে পাঠাতেন না বাইরে। একমাত্র পুত্র, চোখে চোখে রাখতেন।

নিয়তি খণ্ডাবে কে? নয়তো পুকুরের জলেই তো ছেলে স্নান করে, রোজ নন্দীদের পুকুরেই যায়; আজই কেন সে এল এই নিরালা ঘাটে স্নান করতে?

মৃগীরোগের বিপদই এই— কখন যে 'ফিট' হয়ে পড়ে যাবে একটু আগেও টের পায় না রোগী। হরিদাসের বুঝি তাই হয়েছিল, জলে নেমে 'ফিট' হল, কেউ কোথাও নেই— সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের পাঁকে গড়িয়ে গেল।

এই পাঁকেরই বুদ্‌বুদ্‌ উঠছিল জলে।

হাত পা উল্টেপাল্টে অনেক কিছু করলেন অনেকে। মেজদা নানারকম ব্যায়াম জানেন, হরিদাসের মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিলেন কত; কিন্তু হরিদাসের ফুসফুসে হাওয়া আর ঢুকল না। পেট হতে কতকটা জল বেরিয়ে এল শুধু।

ছোটোমামাকে ভয়-ভাবনা করতে দেখি না কখনো। কিন্তু হরিদাসকে জলে ডুবে মরতে দেখে কয়দিন যেন কেমন হয়ে রইলেন। তার পরেই একদিন সকাল থেকে উধাও। বিকেলের দিকে তুলসীমণ্ডপে হৈ চৈ শুনেই বুঝতে পারি ছোটোমামার দল। আবার একটা মস্ত কাছিম এনে ফেলেছেন বাইরের আঙিনায়। এই কাছিম ধরাও একটা নেশা ছোটোমামার।

কোথায় নদীর পারে কাছিম ডিম পেড়ে রাখে, ছোটোমামা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে সেই ডিম বের করে আনেন। একগাদা করে ডিম।

মা রাগ করেন, বলেন—"কবে না জানি সাপের ডিম নিয়ে আসে দস্যিটা। বিপদ ঘটিয়ে ছাড়বে একদিন।"

কাছিম কখন একটু ডাঙায় উঠে রোদ পোহাচ্ছে— ধর ধর— ছোটোমামা ছুটলেন তাকে ধরতে। কাছিমও ছোটে; ছুটে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই ধরে ফেলেন কাছিমটাকে। ধরেই উল্টে ফেলেন। কাছিমকে একবার উল্টে দিলে বড়ো অসহায় সে। আর কিছু করতে পারে না বা চলতে পারে না। সেই উল্টোনো অবস্থায় কাছিমটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসেন বাড়িতে।

এই কাছিম কাটা হয় বাইরের আঙিনায়। কাছিমের কামড় বড়ো শক্ত কামড়। দিদিমা আমাদের সাবধান করেন—"কাছাকাছি যেয়ো না কেউ। একবার যদি কাছিম আঙুল কামড়ে ধরে তবে ছাড়বে না সহজে, আকাশে বাজ না ডাকা পর্যন্ত।"

কাছিমটা ধরা পড়ে রাগে ফোলে। মুখ একবার করে একটু বের করে আবার ঢুকিয়ে নেয়। কাছিমটা কাটবার আগে তার গলাটা আগে কেটে ফেলতে হয়। তবেই নিশ্চিন্ত। কিন্তু মুখ ঢুকিয়ে আছে খোলের ভিতরে, গলা কাটা যায় কি করে?

ছোটোমামা একটা লম্বা কাঠি নিয়ে কাছিমটার মুখের কাছে ধরে নাড়তে লাগলেন। কাছিমটা ক্ষেপে সেটাকে কামড়ে ধরল। ছোটোমামা কাঠিটা ধরে টান দিলেন— কামড়ে-ধরা কাঠির সঙ্গে সঙ্গে কাছিমের গলাটাও বেরিয়ে এল। সঙ্গীরা তৈরি ছিল— সঙ্গে সঙ্গে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল।

এখন আর গলা ভিতরে ঢুকিয়েও লাভ নেই কাছিমের। দড়ি ধরে টানলেই গলা বেরিয়ে আসবে।

এইভাবে গলা বের করে এনে কাছিম বলি হয়।

কাছিম কাটা পদ্ধতি বড়ো নিষ্ঠুর। দেখতে পারি না সামনে দাঁড়িয়ে।

কাছিমের মাংস অনেকে খায়, অনেকে খায় না। কাউঠ্ঠার মাংস নাকি খেতে ভালো। কাউঠ্ঠাও দুই রকমের—কালি কাউঠ্ঠা আর উবা কাউঠ্ঠা। উবা

কাউঠ্ঠা ক্ষেতে থাকে, সাদাটে, গায়ে খোপ খোপ নকশা। কালি কাউঠ্ঠাই খায় লোকে। কালীপূজার সময় কাউঠ্ঠা খাওয়ার এক হুজুগ পড়ে যায়।

কাউঠ্ঠার খোলাগুলির জন্য আগ্রহ থাকে গৃহস্থের। কাউঠ্ঠা মারা হলে খোলাগুলি পড়ে থাকে বাইরে একপাশে। রোদে জলে একদিন তা ধুয়ে শুকিয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। গৃহস্থেরা তখন খোলাগুলি ঘরের বাইরের দিকে বেড়ার গায়ে টাঙিয়ে রেখে দেন। এমন জায়গায় রাখেন যেন সহজেই নজরে পড়ে চোরের। চোরের কাছে 'অযাত্রা'— এ জিনিস। চুরি সফল হয় না দেখলে।

পুবের বাড়ির ফুলখুড়ির অথর্ব বুড়িমা এসে আছেন মেয়ের কাছে। তিন-কুলে আর কেউ নেই বুড়ির, এই মেয়ে ছাড়া। বুড়ি চলতে পারেন না, দেখতে পান না, কানে শোনেন না। দিনরাত মেঝের একধারে পাতা বিছানায় শুয়ে থাকেন। ইদানীং বুড়ির এক 'বাই' হয়েছে কেবলই 'খাই খাই' করেন। খাবার না পেলে জোরে জোরে কাঁদেন, মেয়েকে বকাবকি করেন। দাঁত নেই, জরাজীর্ণ দেহ—কথা বোঝা যায় না; শুধু রেগে গর্ গর্ করতে থাকেন।

ফুলখুড়ি কি করেন, বেতের সাজিতে করে মুড়ি রেখে দেন পাশে। বুড়ি হাত বাড়িয়ে অবিরত মুড়ি তুলে তুলে মুখে দেন। মুখে গিয়ে আর কটা মুড়ি পড়ে, মাটিতে বিছানায় মুড়ির ছড়াছড়ি। —মুড়ির ফুলশয্যা যেন; রাত্রেও শোবার সময়ে ফুলখুড়ি বুড়ির বিছানার পাশে এক সাজি মুড়ি রেখে দিয়ে ঘুমোতে যান। বুড়ির চোখে ঘুম নেই। সারারাত শীর্ণ হাতে মুড়ি তোলেন আর মুখে দেন।

একদিন রাত্রে চোর এসে সিঁদ কাটল ভিতে, ফুলখুড়ির ঘরে। বাইরে থেকে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে চোর এসে ঠেকল— বুড়ির মুড়ির ডালাটা আছে যেখানে ঠিক তার তলায়। শেষ মাটিটা খসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুড়ির ডালা উল্টে ঝুরঝুর করে মুড়িগুলি পড়ে গেল গর্তে। হঠাৎ এভাবে মুড়ি পড়তেই চোর হকচকিয়ে গিয়েছিল। ওদিকে বুড়ি মুড়ির জন্য হাত বাড়িয়েছে— শুকনো কঙ্কালসার হাতের আঙুলগুলি এসে লাগল চোরের শাবল ধরা হাতে। আর যায় কোথায়! চোর 'বাপ্‌গো মাগ্‌গো' বলে দে ছুট। ঘরে বুড়িও কেঁদে চেঁচিয়ে একাকার— তার মুড়ির ডালা কে সরিয়ে নিল এখান থেকে?

পরদিন সকলে বলাবলি করলেন— ফুলখুড়ির ঘরের বেড়ার গায়ে ছিল এক সারি কাউঠ্ঠার খোল টাঙানো, সকলে বললেন— এইজন্যই চোর এসে খালি-হাতে ফিরে গেল।

নন্দীদের পুকুরে মাছ 'গাবিয়ে' উঠল একদিন।

এক এক বছর ওঠে এমনি। রোদের তাতে জল গরম হয়ে তলার পাঁক ফেঁপে ওঠে। মাছগুলি শ্বাস বন্ধ হয়ে ভেসে ওঠে। একটা দুটো মরা মাছ ভেসে উঠলেই সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুকুরে। তাড়াতাড়ি জ্যান্ত সব মাছ ধরে ফেলে।

এবারকার গাবানো দেখতে পেলাম আমিই আগে। যাচ্ছিলাম দিদিমার সঙ্গে পুকুরের পুব পার দিয়ে। এ পথে লোক বেশি চলে না। ঘাসে ভরা পথ। পুকুরের ধার ঘেঁষে হাঁটছি আর জল দেখতে দেখতে পথ চলছি। দেখি পারের পাশে জলে একটা বাতাসী মাছ ভাসছে যেন।

দিদিমাকে দেখালাম। দিদিমা বললেন,—"ঐ তো আর-একটা— ঐ একটা। মাছ গাবিয়েছে। খবর দে সবাইকে।"

ঘাট্‌লায় যাঁরা ছিলেন শুনে হাঁকাহাঁকি লাগালেন।

মুহূর্তে বাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল পুরুষরা— কারো হাতে ঝাঁকি জাল, কারো হাতে ছাঁকা জাল; কারো হাতে পলো, কারো হাতে টেটা।

দেখতে দেখতে ভরে গেল পুকুরের চার পাড়। কত লোক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাত দিয়ে মাছ ধরতে।

আমরা উৎসাহে উত্তেজনায় কেবল চার পাড় দৌড়ে দৌড়ে ঘুরি। স্থির থাকতে পারি না এত এত মাছ দেখে। এক-একটা জাল ওঠে আর এক এক রাশি বাতাসী, চেলা, মেনী, ট্যাংরা, চান্দা—কিলবিল করে। পলো চেপে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে কত কই-মাগুর ধরা হচ্ছে। টেটা ছুঁড়ে মাছ গেঁথে তুলছে কতজনে।

ছোটোমামা হাতে ছাঁকা-জাল নিয়ে পাড়ে পাড়ে ঘুরছেন, ঝপ্ করে জাল জলে ফেলছেন, আর জাল ভরা ভরা মাছ তুলছেন। মাছের ভিতর থেকে বেছে বেছে 'ট্যাপ ট্যাপা' মাছগুলি ছোটোমামা আমাদের ছোটোদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছেন। ছোট্ট মাছ, এ মাছ খায় না। আমরা খেলি এই মাছ নিয়ে। এর লেজ ধরে বাঁই বাঁই করে ঘোরালেই পেটটা বেলুনের মতো গোল হয়ে ফুলে ওঠে। যত ফোলে তত ঘোরাই, ঘোরাই আর ছড়া কাটি—

—'ট্যাপট্যাপা লো ভাতের কাঠি
ঝিনুক আর তোর নাক—টা কাটি।'

পুকুরের সব মাছ ধরা হয়ে যায়। যে কয়টা বাকি থাকে পরে তাও ভেসে ওঠে।

এই পুকুরে এখন বেশ কিছুদিন কোনো মাছ নিশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারবে না, কেবল কই মাগুর শিঙি শোল ছাড়া। এরা গাবায় না, মরেও না। তা মাছের

জন্য ভাবনা নেই। বর্ষাকালে গাঙের জলে যখন পুকুর ডুববে— কত মাছ ঢেলে দিয়ে যাবে পুকুরে।

ঝিনুকও অনেক ওঠে জালে। ঝিনুকের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বড়ো বড়ো দেখে ঝিনুক বেছে নিই আমরা। মামারাই খুলে ভিতরের প্রাণীটা বের করে পরিষ্কার করে দেন। একবার একটা বেশ বড়ো মুক্তো পাওয়া গেল একটা ঝিনুকে। মেজদা ঝিনুকটা আগেই নিয়ে নিয়েছিলেন, তাই মুক্তোটাও তাঁরই প্রাপ্য হল। মেজদা সেটা নিজের মুখে পুরে রেখে দিলেন। খান, দান, মুক্তোটা হাতে নিয়ে রাখেন, আবার মুখে ফেলে দেন। দিন-দুই চলল এমনি।

মেজদা সকল কাজেই আমাদের কাছে বাহাদুরি নিতেন। একদিন ঘাটে গেছেন— কুলকুচির জলটা কতদূর পর্যন্ত ছিটিয়ে ফেলতে পারেন আমাদের দেখাবেন। মুখভরা জল নিয়ে ফু করে পুকুরে ছিটিয়েছেন, মুখের মুক্তোটাও সেইসঙ্গে পুকুরে গিয়ে পড়ল। মেজদা বোকা বনে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঝিনুক আমাদের সকল সময়ে সঙ্গে থাকে— কাঁচা আমের দিনে। ঘাটের সিঁড়িতে ঝিনুকটা ঘষে ঘষে মাঝখানটায় একটা ফুটো করে নিই। এই ফুটো দিয়ে চেঁচে কাঁচা আমের গায়ের খোসা তুলি, কাঁচা আম পাতলা পাতলা করে কাটি। খুব তাড়াতাড়ি কাটা হয়ে যায় এইরকম ঝিনুক দিয়ে। ঝিনুকই আমাদের হাতের ছুরি। যত্রতত্র ঘুরি, এই ছুরি দিয়ে কাঁচা আম কাটি, নুন মিশিয়ে খাই। একটা ঝিনুক খারাপ হয়, কি হারিয়ে যায়— আর-একটা তৈরি করে নিই।

কাগজে মোড়া কিছুটা নুন আমাদের সকলের সঙ্গেই থাকে। নুন সঙ্গে রাখা আমাদের একটা অভ্যেস। জাম, বড়ই, তেঁতুল, কামরাঙা, কাঁচা আম— সবকিছু খেতেই নুন লাগে। আর ঐ-সমস্ত তো যখন-তখন খাই। পথ চলতে চলতে খাই, খেলতে খেলতে খাই; গাছের ছায়ায় সাথীরা একসঙ্গে বসে গল্প করতে করতে খাই। নুন সঙ্গে না থাকলে চলে না। শীতকালে বাড়ির পিছন দিকে দত্তদের মটর খেসারির ক্ষেত, কচি কচি মটরশুঁটি ধরেছে ক্ষেতে। আমরা কোঁচড় ভরে মটরশুঁটি তুলি, এদিক ওদিকে পড়ে থাকা ভাঙা হাঁড়ি-কলসির টুকরো জোগাড় করে, ক্ষেতের চাকা চাকা তিনটে মাটির টুকরো সাজিয়ে উনুন করি, তাতে শুকনো পাতার আগুন জ্বেলে হাঁড়ির টুকরোতে নুন জল দিয়ে মটরশুঁটি সিদ্ধ করি। এই সিদ্ধ মটরশুঁটি দাঁতে টেনে টেনে খাই, খেয়ে বাড়ি ফিরি। চমৎকার লাগে খেতে। মাকে লুকিয়ে করি এ-সব। দিদিমা জানেন।

দিদিমা আমাদের সকল কাজের সঙ্গী।

ঝড় উঠল— কাঁচা আম কত-না জানি তলায় পড়ল। 'গুণে'র বাড়ির আমবাগানটা আমাদের বাড়ির পিছনেই। 'ও দিদিমা, দিদিমা গো'— টানতে টানতে দিদিমাকে নিয়ে ছুটি। ঝুড়ি ঝুড়ি আম কুড়োই।

একদিন এমনি ঝড়ের মুখে যেতে যেতে আরো জোরে ঝড় এল, আরো জোরে হাওয়া ছুটল। বিজন পথ। ঝড় আমাদের উড়িয়ে নিতে চায়। সামনে একটা মোটা চালতে গাছ, দিদিমা আমাকে আগলে নিয়ে চালতে গাছটা আঁকড়ে ধরলেন। দিদিমার থান ধুতির পাতলা আঁচলটা হাওয়ায় তোলপাড় করতে লাগল।

বাড়ি ফিরে এলে পরে দেখা গেল দিদিমার আঁচলের খানিকটা নেই। ঝড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

মা খুব বকলেন আমাকে উদ্দেশ্য করে।

পরদিন যখন চুপি চুপি দিদিমাকে বললাম, "ঐ চালতে গাছটায় পাকা চালতের গন্ধ পেয়েছি। চালতে মাখা খাব।" দিদিমা কোটা হাতে আবার এলেন, পাকা চালতে পেড়ে দিলেন।

গরমের দিন, লম্বা বেলা। দুপুরে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে শুয়ে তালপাতার হাতপাখা দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে গা এলিয়ে খানিক গড়িয়ে উঠেও বেলা থেকে যায় অনেকখানি। এই সময়টায় আম, জাম, চালতা, বড়ই—এক-একদিন এক-একটা 'মাখা'— খেতে বড়ো আরাম। এই 'মাখা'ই কত রকমের! এক-একটা মাখার এক-এক পদ্ধতি। কাঁচা আম পাতলা পাতলা করে কেটে নুন লঙ্কা লেবুপাতা কাসুন্দি দিয়ে চট্‌কে মাখা— এর যেন একটা অপার্থিব স্বাদ। পাথরের খাদা ভরা আম মাখা ঘুরে ঘুরে বাড়ির সবাইকে বিলোই। মা'ও হাত পেতে নেন খানিকটা। ঘরে বাইরে দাওয়ায় উঠোনে তখন সর্বত্র নুন-ঝাল-টক মেশানো স্বাদের একটা শব্দ ওঠে সবার মুখ থেকে।

পাকা চালতে শিলনোড়ায় ছেঁচে মাখতে হয়। এর অনুপান আলাদা। এতে শুকনো লঙ্কা পুড়িয়ে দিই, আর একটু গুড়। বড়ই মাখায় তো শুল্কা পাতা চাই-ই চাই। আর বেথুইল মাখা— এর পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা।

থোকা থোকা বেথুল ঝুলে থাকে বেতবনে। বেত-লতায় লম্বা লম্বা সরু লিকলিকে শিষ, খুদে খুদে বঁড়শির মতো উল্টোমুখী এক সারি কাঁটা শিষের গায়ে। শিষগুলি বেতঝোপ থেকে আলগা হয়ে আথালিপাথালি দোলে হাওয়ায়। কাছে গেলে গায়ে লাগবেই, গায়ের ছাল আঁচড়ে দেবে, শাড়ি ধুতি ছিঁড়ে যাবে ছাড়িয়ে

নেবার কালে। এ হবেই। ছোটোমামা গ্রাহ্য করেন না আঁচড়-কামড়ে; বেতঝোপ থেকে ডালা ভরে আমাদের বেথুইল পেড়ে দেন। দু হাতে তাঁর কষকষ রক্তবিন্দু ফুটে থাকে কয়েক সারি।

ছোটো ছোটো ফল বেথুইল। গায়ে শক্ত খোসা— মাছের আঁশের মতো অনেকটা। সাদাটে রঙ: কয়েক শো করে ফল থাকে এক-এক থোকায়।

খোসা ছাড়িয়ে ফলগুলি 'টুরি'তে রাখি। বেতের টুরি— এই টুরি দিয়ে চাল মাপা হয়; ছটাক টুরি, পোয়া টুরি, আধসেরী টুরি, একসেরী টুরি—সোওয়াসেরী টুরি পর্যন্ত আছে। আমাদের আধসেরী টুরিতেই হয়ে যায়। টুরি নইলে বেথুইল মাখা হয় না। আবার— চাল মাপা হয়, ব্যবহৃত এমন টুরিই চাই— চালের একটা সোঁদা গন্ধ হয় তা হলে মাখায়।

টুরিতে বেথুইল রেখে নুন কাসুন্দি দিয়ে উপরে একটা পাথরবাটি চেপে এটা হাতে নিয়ে ঝাঁকাতে থাকি। বেথুইল নরম হতে অনেক সময় নেয়। টুরি হাতে বাড়িময় ঘুরি আর ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে বলি— 'আম পাকে, জাম পাকে, মামাবাড়ির বেথুই—ল পাকে'। শক্ত বেথুইল নরম হয় না মামা-বাড়ির দোহাই না দিলে।

টকটক কষকষ স্বাদ বেথুইলের, খুব ভালো লাগে খেতে আমাদের।

ঘরে আর কতটুকু সময় থাকি আমরা, বাইরে বাইরেই ঘোরাঘুরি করি।

গ্রামে কোথাও কিছু-একটা ঘটনা হতে থাকলে সেখানে গিয়ে ভিড় করে থাকি।

উল্কি পরার হুজুগ উঠল গ্রামে। দলে দলে সকালে উল্কি পরতে লাগল। নয়া বাড়ির যশোদী বইনের হাত খুব ভালো, তিনিই উল্কি আঁকছেন সবার। কেউ হাতে লিখছে নাম, কেউ বুকে। আমাদের দু বোনেরও শখ গেল হাতে নাম লিখব। দুপুর থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যশোদী মাসী আমাদের বললেন— হাতের উপরে নামটা লিখে রাখতে আগে হতে।

একরকম ঘাস-পাতা আছে— সেটা ভাঙলে দুধ বের হয়। এই দুধের মতো কষটা দিয়ে যার যা পছন্দ লিখে তার উপরে যশোদী মাসী ছুঁচ ফুটিয়ে চলেন। কষটা ভিতরে রক্তের সঙ্গে মিশে পরে সবুজ হয়। কয়দিন অবশ্য ফুলে পেকে লাল হয়ে ওঠে, পরে শুকিয়ে ঠিক হয়ে যায়।

আমরা দু বোনে আঁকা বাঁকা অক্ষরে পুরো হাত ভরে নাম লিখলাম। সব নামটা হাতে আঁটেও না—শেষের দিকে অক্ষর ছোটো হয়ে গেল। দিদি লিখলেন নাম নিজের বাহুতে, 'শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী'। চুনি ইন্দুরা নিজ নিজ নামের শেষে 'দাসী' লেখে, আমরাও তাই লিখলাম। আমার নাম দাদামশায় রেখেছিলেন

'সরমা'। আমি লিখলাম আমার বাহুতে 'শ্রীমতী সরমাসুন্দরী দাসী'। লিখে হাত টান করে দাঁড়িয়ে আছি, পাছে ঘষা লেগে লেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়।

যশোদা মাসীর হাত কামাই যায় না। একের পর এক বড়োরা এসে বসছেন সামনে হাত পেতে বুক পেতে— আর যশোদা মাসী পুটপুট করে ছুঁচ ফুটিয়ে চলছেন। আমাদের আর ধৈর্য থাকে না। বেলা পড়ে আসছে।

যশোদা মাসী কেবল সান্ত্বনা দেন—"দাঁড়া, এইটা হয়ে গেলেই তোদের হাত করে দেব।"

এই করতে করতে সন্ধে হয়ে এল। আর বুঝি হল না আমাদের। দু বোনেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললাম। যশোদা মাসী আমাদের টেনে নিলেন, নিয়ে কপালে দু ভুরুর মাঝখানে একটি ছোট্ট তিলের মতো উল্কি এঁকে দিলেন। বললেন, "আজ এই নিয়েই যা।—কাল হাতে নাম লিখে দেব।"

বাড়িতে ফিরলাম। একে তো সন্ধে হয়ে গেছে, কোথায় গেছি কী করছি বলে যাই নি। তায় কপালে উল্কি। মা খুব কয়েকটা চড়চাপড় মারলেন।

মা'র মারের ভয়ে আর আমাদের হাতে উল্কি লেখা হল না।

নদীর পারে 'বেদে-বেদেনীরা' আসে। নৌকোয় নৌকোয় থাকে, নৌকোতেই তাদের ঘরসংসার। দিনের বেলা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। নদীর পার, বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে সারাদিন পাখি শিকার করে। ওদের শিকার করার কায়দাটা অদ্ভুত। মামাদের মুখে শুনি গল্প;— বেদেরা বড়ো গাছের নীচে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থাকে। ডালে একটা পাখি বসল কি, ওরা বাঁশের ডগায় একটা তীর বেঁধে সেই বাঁশের নীচে আর-একটা বাঁশ আটকে দেয়— তার তলায় আর-একটা। ধীরে ধীরে এইভাবে বাঁশ জুড়ে জুড়ে লম্বা করে উপরের দিকে তোলে। তুলে পাখির কাছ পর্যন্ত এসে তীরটা দিয়ে খোঁচা দেয়। অতি সন্তর্পণে করে এই কাজ। পাখিটা টেরও পায় না। আগডালে বসা পাখিও এরা মারে এইভাবে।

বেদে-বেদেনীরা নদীর পারে এসেছে শুনলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে গ্রাম। এদের হাত খুব সাফাই। সতর্ক না থাকলে অনেক কিছু 'খোয়া' যায় গৃহস্থের এ সময়ে। এদের ভয় পাই। দিদিমা বলে রেখেছেন— বাইদা বাইদানীরা তুক্‌তাক্ জানে, একা একা কাছে যেন না যাই কখনো।

এরা বাংলাতেই কথা বলে। তবে সুরটা অন্যরকম, কেমন একটা টান কথায়। বেদেনীরা বাড়ি বাড়ি আসে, সঙ্গে থলি ঝুড়ি নানা কিছুতে ভরা। তারা ঝাড়-ফুঁক করে। বিষ ঝাড়ে, গোদ ঝাড়ে। শিঙা দিয়ে গোদ হতে রস পুঁজ টেনে

নেয়—পা হাল্কা করে দেয়। অবাক হয়ে দেখি। যেন ভেল্কিবাজি। ফুলমামা দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন কয় দিন ধরে। বেদেনী বললে, দাঁতে পোকা হয়েছে, পোকা বের করে দেবে। মামা বসলেন কাছে; বেদেনী থলির মুখে হাত পুরে খানিকটা তুলো বের করে মামার দাঁতের গোড়ায় দিয়ে হাত নেড়ে মুখ নেড়ে সুর করে কী সব বলে মুখ থেকে তুলো বের করে আনল। দেখা গেল সাদা সাদা নরম দুটো পোকা তাতে।

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন তাঁর দাঁতের ব্যথা সত্যিই নেই আর।

বেদেনীদের সঙ্গে আরো অনেক জিনিস থাকে, মনিহারী জিনিস। সেপটিপিন, চুলের কাঁটা, ফিতা, চিরুনি, আয়না— বউ-মেয়েদের শখের নানা দ্রব্য। মামীরা কিনলেন কিছু কিছু। বেদেনীরা চাল পয়সা নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।

সন্ধে পর্যন্ত বেশ ছিলেন। রাত্রে ফুলমামার আবার ডাক-চিৎকার— দাঁতের ব্যথায়।

আমার চোখে তখনো ভাসছে পোকা দুটো। মামার যদি আবার দাঁতে ব্যথা হল তবে ঐ পোকা দুটো কি? এল কোত্থেকে?

গরমের সময় একদিন এক ফকির সাহেব এলেন আমাদের বাড়িতে। সিদ্ধেশ্বরীতলায় এসে বসেছিলেন সকাল থেকে। পথিক, চাষী, সব ভিড় করেছিল তাঁকে ঘিরে। গ্রামে এসে রটল কথা— মস্ত এক ফকির এসেছেন সিদ্ধেশ্বরীতলায়, অনেক তাঁর গুণ, অনেক কিছু জানেন।

মেজোমামা গিয়ে নিয়ে এলেন ফকির সাহেবকে বাড়িতে।

সন্ধে হয় হয়। সন্ধের অতিথিকে রাত্রের আশ্রয়ও দিতে হয় গৃহস্থের।

পুবের ঘরে নিয়ে বসানো হল ফকির সাহেবকে।

এবাড়ির ওবাড়ির লোকও তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে বসলেন তাঁকে ঘিরে। অনেক কিছু শুনবেন, অনেক কিছু দেখবেন। সবার মনেই অদম্য কৌতূহল— না জানি কী অলৌকিক কিছু দেখাবেন ইনি রাত্রি গভীর হলে! আমিও বসে আছি মা'র পাশে।

কালো চাপ দাড়ি মুখে, মাথায় কালো চুল, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার ফকির সাহেব বড়োজোর চিনিমামাদের বয়সী, তার বেশি নয়।

ফকির সাহেব কী খাবেন রাত্রে— মা মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আগেই খাবারের কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাঁকে। ফকির সাহেব বলেছিলেন— 'সবার খাওয়া হোক আগে'।

এখন তো সবার খাওয়া হয়ে গেছে। এবার?

ফকির সাহেব স্মিত হেসে বললেন, "আমার খাবার জন্য ব্যস্ত হবেন না, আমার খাবার এই ঘরেই আছে।"

মা'রা খুশিতে যেন ভরপুর হয়ে উঠলেন এ কথা শুনে। 'কার'-এ মোয়ামুড়ি সবই আছে, তা হলে বুঝি তাই খাবেন ফকির সাহেব। ভাবলেন— এঁরা তো জানতে পারেন সব-কিছুই। ভূত-ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা যিনি, তিনি 'কার'-এর উপরে কী আছে না জেনে পারেন?

গ্রামের রাত্রি অল্পেতেই গভীর হয়। ফকির সাহেবের সামনে ধুনুচিতে ধুনো জ্বলছে; পিদিমের আলোয় ধুনোর ধোঁয়ায় ঘরে একটা আচ্ছন্ন ভাব।

নারকেলের ছোবড়া টুকরো টুকরো করে কেটে রাখেন মামীরা। সেই টুকরোতে আগুন ধরিয়ে ধুনো জ্বালানো হয় ধুনুচিতে।

ফকির সাহেব ধুনুচিটা কাছে টেনে তা থেকে একটা জ্বলন্ত ছোবড়া হাতে তুলে নিয়ে এহাতে ওহাতের তেলোতে বার দুই-তিন ঝেড়ে কুচো-নিমকির মতো মুখে ফেলে দিলেন আগুনের টুকরোটা। বললেন, "এই আমার খাদ্য।" বলে হাসিমুখে চুপ করে রইলেন।

ঘরের হাওয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই একদৃষ্টে ফকির সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে মা আমাকে জোর করে শুতে পাঠিয়ে দিলেন দক্ষিণের ঘরে। কেবল বড়োরা থাকবেন এখন পুবের ঘরে।

বিষণ্ণ মনে উঠে এলাম। বিছানায় শুয়ে কেবলই ভাবতে লাগলাম, না-জানি আরো কত বিস্ময়কর কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখন ওঁরা সকলে। ফকিরের মুখ, মুখের ভিতরের আগুনের টুকরোটুকুর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠেই পুবের ঘরে ছুটলাম। ঘর ফাঁকা।

ফকির সাহেব কোথায়?

রাত্রে যখন অনিচ্ছায় উঠে আসি ঘর থেকে, ফকির সাহেব আশ্বাস দিয়েছিলেন— কাল দিনের বেলা আমাকে অনেক কিছু দেখাবেন, বলবেন।

প্রাণে একটা বেদনা নিয়ে সবার মুখের দিকে তাকাই।

কথা ছিল ফকির সাহেব কয়েকদিনই থাকবেন এ গ্রামে। কত লোকের কত কথা জেনে নেবার আছে ফকির সাহেবের কাছ থেকে। বাড়ি বাড়ি কাড়াকাড়ি পড়েছিল রাত্রে পরদিন কার বাড়িতে আগে যাবেন তিনি।

ম্যাজিকের মতো মিলিয়ে গেল সে ভিড়?

মামীরা হাসেন। বলেন, মধ্যিরাত্রে সে কী কাণ্ড!

এ দিন দুপুর থেকেই ছোটোমামা বাড়িতে নেই। এমন প্রায়ই হয়। নিজের দলবলের সঙ্গে তাঁর নানা প্রোগ্রাম করা থাকে; নানা জায়গায় ছোটেন, নানা স্থানে রাত কাটান। বড়োরা আর উদ্‌বিগ্ন হন না এ নিয়ে। ছোটোমামা তাঁর ইচ্ছেমতো বাড়িতে আসেন, যান— বাড়ির লোকের এটা গা-সওয়া ব্যাপার।

রাত্রে মামীরাও খাওয়া-দাওয়ার পর যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ সোরগোলে জেগে উঠলেন। দেখেন ছোটোমামা তাঁর অনুচরদের নিয়ে উঠোনের উপর দাঁড়িয়ে। কারো হাতে বাঁশ, কারো হাতে বৈঠা। হুংকার ছাড়ছেন তাঁরা।

ফকির সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছোটোমামার দল তাকে গ্রামের বাইরের পথ পর্যন্ত তুলে নিয়ে আবার অদৃশ্য হলেন।

মা-মেজোমামার মুখে একটু অপরাধী অপরাধী ভাব। কারণ তাঁরাই বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ফকির সাহেবকে নিয়ে।

ছোটোমামা ছিলেন বাবন খাঁ চাচার মেয়ে জামিরন বইনের বাড়িতে। তাঁর ছেলে আবদুল ছোটোমামার বন্ধু। সেখান থেকেই ফকির সাহেব সম্বন্ধে কী যেন সংবাদ জোগাড় করে এনেছিলেন। সে কথা আর আমাদের বললেন না কেউ।

পুবের বাড়ির সুশীলাপিসি অত রাত্রে আর বাড়ি ফেরেন নি। ভোরবেলা পুকুরে ডুব দিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন। চলতে চলতে বললেন, "ছিঃ ছিঃ, কার মনে কী আছে এ কি বোঝা যায়?"

কত রকমের লোক আসে গরমকালের বড়ো বেলায়। চোঙ লাগানো বাক্স মাথায় নিয়ে আসে লোক। এই বাক্সের ভিতর প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় আমাদের। বাক্সের গায়ে চার-পাঁচটা ফুটো, এক-একজন এক-একটা ফুটোয় চোখ রেখে দু হাত দিয়ে চোখের চার দিকটা ঘিরে রাখি। ভিতরে দেখি— বাক্সের দ্বিগুণ বড়ো রঙিন রঙিন ছবি। এই দেখি রাম সীতা, এই দেখি সেখানে দশমুণ্ড রাবণ। রাবণ গেল— এল সম্রাট পঞ্চম জর্জ, তাজমহল, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ— আরো কত কী! ফুটোটা থেকে চোখ তুলতে পারি না। এক সময়ে বাক্সের ভিতরের ছবি বন্ধ হয়ে যায়—সব কালো তখন। অগত্যা উঠে পড়ি। কিন্তু আকর্ষণ যায় না। লোকটা এই বাক্স নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ঘুরি।

আসে পটুয়া— 'গাজীর পট' নিয়ে। মুসলমান পটুয়া। সরু একটা কাগজে হাতে আঁকা পট— রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী সব।

দু দিকে দুই রুলের মতো কাঠিতে জড়ানো থাকে পট। পটুয়া উঠোনে বসে দু হাতে দুই কাঠি ধরে নাড়ে, একটা কাঠি হতে পট বেরিয়ে আসে— সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা কাঠিতে তা গুটিয়ে যেতে থাকে।

পটুয়া পট খুলতে খুলতে গানের ধুয়া ধরে—

'বাবু এখনকার দিনে
শাশুড়ি বউ ঝগড়া করে
সয় না প্রাণে।'

পটুয়ার দু হাত একসঙ্গে নড়ে, ছবির পর ছবি বের হয় আর গুটিয়ে যায়। গানে গানে ছবির বর্ণনা দিয়ে চলে পটুয়া। মকরবাহিনী গঙ্গা, শান্তনুরাজার বিয়ে, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, গঙ্গার পুত্র বিসর্জন— তন্ময় হয়ে দেখি বসে। পটুয়া একটা করে ছবি বদলায় আর বদলাবার ফাঁকটুকুতে আগের দু লাইনের ধুয়া ধরে— 'বাবু এখনকার দিনে'— ধুয়ার কথাগুলি ছবির গানের থেকে আলাদা। ওটা ফালতু। সময় সমাজ বুঝে দুটো লাইন ধুয়া গায়। ধুয়ার কথা কয়টা শুনে বারে বারে সবাই হেসে ওঠে, পটুয়াও হাসে।

গাজীর পটও যেন একটা ম্যাজিক— এই দেখছি— এই গুটিয়ে গেল। শেষ হয়ে গেলেও মনে হয় আরো থেকে গেল। কাঠিটা ঘোরালেই বের হবে।

সবশেষে— দিনের শেষে আসে মুশকিল আসান। কালো জোব্বায় ঢাকা লোক, হাতে একটা গোল প্রদীপের চার দিকে অনেকগুলি শিখা, এসে দাঁড়ায় গৃহস্থের আঙিনায়। সকল মুশকিল আসান হোক গৃহস্থের।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজি— শিখাগুলি চোখের উপর থর্‌থর্‌ করে জ্বলে। সেই আলোতে ফুটে ওঠে পটের ছবিগুলি এক-এক করে।

ওদিক থেকে সমস্বরে একটা হাঁক ওঠে 'হেঁইও,— গুড়খার লাড়ু হেঁইও'।

হাঁকটা এল সরকারদের বাড়ির উঠোন হতে। তাঁদের গোরুর বাছুর হয়েছে সদ্য একটা। বাছুর জন্মালে নতুন দুধ একুশ দিন পর্যন্ত খায় না লোকে। একুশ দিন পর দুধের নাড়ু গড়ে 'গুড়খার' নামে উৎসর্গ করে। পাড়ার ছেলেরা সেই ক্ষীরের নাড়ু খায়।

তাই কারো বাড়িতে নতুন বাছুর হলে এই একুশ দিন সন্ধের পর ছেলেরা দল বেঁধে গৃহস্থের উঠোনে 'গুড়খা'র নামে হাঁক দেয়, ছড়া বলে। একজন এক লাইন বলে, অন্যরা ধুয়া করে— 'হেঁইও'। পুরো ছড়াটা এইভাবে বলে যায়। একুশ দিন পর গৃহস্থ ছেলেদের চাল ডাল তরকারির 'সিধে' দেয়; ছেলেরা চড়ুইভাতি করে।

ছেলেদের উৎসাহে ভাটা পড়ে না কখনো। এরা যেন নদীর ঢেউ, উৎসাহে ফুলে ফুলে ওঠে; এরা নিত্য নতুন।

পৌষ মাসে রাত্রিবেলা বাড়ি বাড়ির উঠোনে এসে এরা ছড়া গেয়ে যায়। এসে আগেই একটা হুংকার ছাড়ে, তার পর সকলে মিলে ছড়া ধরে—

'আইলাম লো শরণে
লক্ষ্মীদেবীর চরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর
ধানে চাউলে ভরুক ঘর'—

ইত্যাদি ইত্যাদি বলে ছড়ার মাঝেই ইঙ্গিত দেয়—

—একটা টাকা পাই রে
বান্যা বাড়ি যাই রে'

—মানে তারা ধরেই নিল একটা টাকা পেয়ে গেল এ বাড়ি থেকে। সেই টাকা দিয়ে বান্যাবাড়ি গেল। টাকা ভাঙাল। জিনিসপত্র কিনল। শেষে— 'ঠাকুরকুলাই— ভোঁ' দিয়ে ছড়া শেষ করল।

নানা ভঙ্গিতে ভাবে বলে ছড়া। শুনে বিছানায় শুয়ে হাসে গৃহস্থরা।

মাসের শেষে প্রতি বাড়ি থেকে ছেলেরা 'সিধে' পায়, পয়সা পায়। নদীর ধারে মহা-উল্লাসে চড়ুইভাতি করে।

মাঘ মাসে ভোররাত্রে ঘুম-চোখে শুনি হারু বৈরাগীর গান। রাত পোহাবার আগে বাড়ি বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে 'জাগরণী' গেয়ে যায়—

"রাই জাগো রাই জাগো রে—
আর কত ঘুমাও গো রাই
কালো মানিকেরই কোলে।"

সারা মন অভিভূত করে রাখে শীতের কুয়াশায় ভারী গলার এ ভৈরবী সুর।

১৬

কারুকর্মে মার খুব শখ। সংসার মার সকল সময়টা কেড়ে রাখে; তারই মধ্যে দুপুরবেলায় কিছুটা সময় মা আলাদা করে রাখেন। এ সময়টা তাঁর হাতের কাজের জন্য বরাদ্দ। বরাবর দেখে এসেছি সংসারের সব কাজ সারা হলে মা তাঁর হাতের কাজ নিয়ে বসেন। এর আর নড়চড় হয় না কোনোদিন।

মার কাছে মামীদের হাতের কাজের হাতে-খড়ি। নিখুঁত, পরিপাটি না হয়ে পারে না। মামীমারাও তাই হাতের কাজে নিপুণ সকলে।

সন্ধেপ্রদীপ জ্বালতে পলতে লাগে, রোজ রোজ পলতে বানানো মার পছন্দ নয়। বছরের পলতে মা একসঙ্গে করে রাখেন। একদিন মা বসেন মামীদের নিয়ে একটা করে মাটির নতুন মালসা কোলের কাছে উল্টে নিয়ে। মালসার উপর সাদা কাপড়ের সরু টুকরোগুলি রেখে হাত দিয়ে পাকিয়ে পলতে করতে লাগলেন। সমান মাপের সরু সরু পলতে তৈরি হল এক রাশি।

পলতে রাখার জিনিসটিও কত সুন্দর করে বানানো। আধ হাত মতো লম্বা ইঞ্চিখানেক চওড়া বাঁশের কাঠিতে রঙিন সুতো জড়িয়ে নক্‌শা তোলা হয়েছে আগে থেকে। এইরকম দু-দুটো কাঠির চাপে পলতেগুলি সাজিয়ে এক সারি পলতের কাঠি ঝুলিয়ে দিলেন বেড়ার গায়ে, যেন এক সারি নন্দদুলাল ফুটে রইল সেখানে। রোজ যতটা পলতে লাগে টেনে টেনে নাও, একটা শেষ হলে আর-একটাতে হাত দাও। পলতে খুলে পড়বে না, নষ্ট হবে না— রোজ বানাবার ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

'জোত্' বানান কত সুন্দর করে। মিলের শাড়ি তাঁতের শাড়ি পুরোনো হয়, ছিঁড়ে যায়; টকটকে রঙিন পাড়টা তেমনিই থাকে। এই সুতো খুলে জড়িয়ে গুটি করে রাখেন। পরে এই দিয়ে কাঁথায় নানা নক্‌শা তোলেন, জোড় বোনেন, শিকা করেন। অনেক সময়ে পুরো পাড় জুড়ে বিছানা-ঢাকা বাক্স-ঢাকাও করেন। অতি সুচারুরূপে করেন সব।

জোত্ বোনেন— পুরোনো কাপড়ের ফালি পাকিয়ে আট-দশটা লম্বা লম্বা দড়ির মতো বানিয়ে একদিকটা বেঁধে থামের গায়ে আটকে নেন। তার পর দড়িগুলি পাশাপাশি নিয়ে নানা রঙের সুতো জড়িয়ে জড়িয়ে নক্‌শা তোলেন। জোতে বরফি জাতীয় নকশাই বেশি হয়। চওড়া চওড়া বেল্টের মতো মোটা শক্ত জিনিস জোত্। এইরকম দুটো জোত্ টানিয়ে তাতে দোলনার মতো একটা তক্তা পেতে বিছানা বালিশ তুলে রাখা হয়।

কয়েক জোড়া করে জোত্ টানানো থাকে এক-একটা ঘরে— জনে জনের বিছানা তুলে রাখতে।

রঙিন সুতোর শিকা— এতেও ওঠে নানা নক্‌শা নানা রঙে। বোতল রাখার শিকাগুলি মা করেন ক্রোশে দিয়ে বুনে। রঙিন শিকাগুলি সারি সারি ঝোলে— ঘর উজ্জ্বল করে।

কাঁথা করেন— সুজনির চাইতে মজবুত হয় এই পুরোনো কাপড়ের কাঁথা— সুজনির চাইতে সুন্দর। কত রকমের নক্‌শা এতে, কত রঙের বাহার। রঙ নক্‌শার ছন্দে মিলে যেন গীত এক-একখানা।

কাঁথা পাতাই তো একটা বিশেষ ব্যাপার। মা মাটির মেঝেতে ছোটো ছোটো কাঠির খুঁটি পুঁতে কাঁথা টানা দেন আগে। তিন-চার পরত পুরোনো শাড়ির কাপড় বিছিয়ে সমান সোজা রাখা সহজ কথা নয়। কোথাও একটু কুঁচকে গেলে কাঁথা টেরা-বাঁকা হয়ে যাবে, দেখতে খারাপ হবে। কাঁথা টানা দিয়ে মা বড়ো বড়ো ফোঁড়ে লম্বা লম্বা সেলাই দেন মাঝখানে কয়েকটা। কাঁথা আঁকেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁথা গুটিয়ে রাখেন। এবার সময়মতো রোজ যেখানে যতখানি সেলাই করতে পারেন করবেন, আবার তুলে রাখবেন। বেশ সময় লাগে এক-একটা কাঁথা শেষ করে তুলতে।

'ছাঁচ' কাটা যখন হয় তখন 'ছাঁচ' কাটারই মরসুম পড়ে। ক্ষীর তক্‌তি, সন্দেশ, গঙ্গাজলি— মিষ্টিরই কত রকম ছাঁচ। মিষ্টির ছাঁচ পাথর কেটেও করেন, আবার কাঁচা মাটি কেটেও করেন। কাঁচা মাটির ছাঁচ আগুনে পুড়িয়ে নিতে হয় পরে।

কিন্তু আমসত্ত্বের ছাঁচ হয় সব পাথর কেটে। পাখি পদ্ম গাছ মাছ— নানা নমুনার ছাঁচ। ছোটো ছোটো বাটালি দিয়ে মা ছাঁচ কুরে কুরে কাটেন। আমসত্ত্বের ছাঁচ কাটার ধরন আলাদা, প্রতিটি পাপড়ি, পাতার মাঝখানটায় পদ্ম তুলে কাটতে হয়। তবেই ছাঁচের আমসত্ত্বখানি উঠবে যখন— পদ্ম পাখি পাতা লতা— কাটে কাটে প্রতিটি ফুটে উঠবে উপর দিকে। মিষ্টির ছাঁচে এটার দরকার হয় না।

নিরামিষ ঘরের বেশির ভাগ বাসনই পাথরের। পাথর শুদ্ধ জিনিস। তবে ভাঙে বেশি। সারা বছরের ভাঙা পাথর জমা থাকে ঘরে। বর্ষাকালে যখন জলে জলাকার চার দিক— তখনই ঘরে বসে বসে ছাঁচ কাটেন ঘরের মেয়ে-বউরা।

মা-মামীদের এই-সব কারুকর্মের শেষ নেই। ঘরে, দাওয়ায় যখন হাতের কাজ নিয়ে মার দলের কলরব, দিদিমা তখন লম্বা দাওয়ার একপাশে বসে খুঁটির গায়ে আটকে রাখা ঝেড়ে ফেলা পাটের আঁশগুলি নিয়ে আঙুলে পাকিয়ে বিনুনি গেঁথে হাঁড়ি কলসি রাখবার বড়ো বড়ো শিকা বানান, ছেলে ঘুমোবার দোলনা করেন। আর বউ-ঝিদের চুল আঁচড়ে ফেলে দেওয়া জটবাঁধা চুলগুলি একটি একটি করে খুলে সাজিয়ে গিঁট বেঁধে— 'গুছি' তৈরি করে রাখেন।

এই-সব অকেজো তুচ্ছ জিনিস দিয়েই দিদিমার কারবার। কাজের প্রতিযোগিতায় নেই দিদিমা— আছেন প্রয়োজনে।

গ্রামে এই যত রকমের কাজ— যত বৈচিত্র্যপূর্ণ— তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ এক একটি দিন। বছরে বারো মাসের তেরো পার্বণের মধ্যে আড়ম্বরের সংক্রান্তিই আছে কতকগুলি। প্রতি সংক্রান্তিতে সব-কিছু ধোও, মেঝেতে পিঁড়াতে নতুন করে গোবর-মাটির প্রলেপ দাও, রান্নাঘরের মাটির ভাতের হাঁড়ি 'ছিটালে' ফেলো, ঝুল ঝাড়ো, তাক মোছো, আনাচকানাচ ঝাঁট দাও— নতুন করে আবার সংসার শুরু করো।

ভাদ্রের পরে আশ্বিন মাস— দুর্গাপূজার মাস। ভাদ্রের সংক্রান্তিতে কাজ বেশি। এ দিন বাড়িতে 'অরন্ধন'। রান্না করার সময় কোথায় বাড়ির মেয়েদের?

আশ্বিনের সংক্রান্তি— ধীর শান্ত। শীতল জিনিস খাও, শীতল হয়ে থাকো। হেমন্তের কালটা ভালো নয়। হাওয়া, 'ওম' ভারী— এ-কথা শুরুতেই মনে রাখতে হয়। মামীরা আশ্বিন সংক্রান্তিতে ভাত রান্না করে জল ঢেলে রাখেন, পরদিন ভিজে ভাত খান। বলেন— 'আশ্বিনের ভাত কার্তিকে খায়, যেই বর মাগে সেই বর পায়'।

এই আশ্বিনের গার্‌সি-সংক্রান্তিতেই 'ভালাভুলা' বানানো হয়। বাঁশের মাথায় খড় দড়ি দিয়ে মানুষের মতো একটা গোল মাথা— দু দিকে দুটো হাত বানিয়ে ভালাভুলা বাঁধো। ভিতরে দেয় মশা মাছি আর ইচা-খৈল্‌সা মাছ।

ছোটোমামা সন্ধেবেলা এটা জ্বালিয়ে হাতে নিয়ে বাড়ির চার দিকে ঘোরেন আর বলেন—'মশা মাছি দূর হ— সাপ ব্যাঙ দূর হ— ভুল-ভাল দূর হ।' বলেন— 'ইচার কাড়া বৈচার মুড়া, ভুল গেল রে উত্তর মুড়া।' বলে 'ভালাভুলা' উত্তর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেন। মশা মাছি সাপ ব্যাঙের সঙ্গে যা কিছু ভুলভ্রান্তি তাও দুর হয়ে যাক আজ গৃহস্থের সীমানা হতে।

এই ভালাভুলা পোড়াবার উৎসাহে সকালবেলা গড়া হতে সন্ধেবেলায় পোড়ানো অবধি ছোটো মামার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি।

আসে পৌষ সংক্রান্তি। মহা ধুমধামের সংক্রান্তি। বসতভিটার মঙ্গলের জন্য বাস্তুপূজা হয় এ দিন। তুলসীমণ্ডপে 'ঝিকা' গাছের ডাল কেটে তার তলায় পুজো হয়। পুরুতমশাই নিজে 'চরু' রান্না করে দিয়ে যান। আজ এই চরু-ই পূজার প্রধান অঙ্গ।

এ গ্রামে ব্রাহ্মণ নেই। পাশের গ্রাম থেকে আসেন সীতানাথ পুরোহিত। কত বাড়িতে পুজো করতে হয় তাঁকে— ছুটে ছুটে বাড়ি বাড়ির পুজো সারেন। পাটশল্‌মি দিয়ে আগুন জ্বেলে নতুন মাটির হাঁড়িতে দুধে চালে বাতাসায় কোনো রকমে ফুটিয়েই 'নমো নমো' বলে পুজো সাঙ্গ করে লাল গামছাখানা কাঁধে ফেলে ছুট লাগান।

মামীরা আড়ালে হাসেন।

চৈত্র সংক্রান্তি— 'ভাইছাতুর' দিন। তিন মাথায় ভাই দাঁড়ায়, বোন মুঠো মুঠো খইয়ের ছাতু ভাইয়ের পায়ের ফাঁক দিয়ে উড়িয়ে দেয়— বার বার তিন বার। বলে— 'ভাইয়ের শত্রু নিপাত হোক।'

মার অনেক ভাই, মা অনেক ছাতু ওড়ান। তে-মাথার পথটা সাদা হয়ে যায়।

আজ ছাতুরই দিন। বোনরা ছাতু খায়, ভাইয়ের পাতে ছাতু তুলে দেয়। দই দিয়ে ছাতু মেখে খায় সকলে। আমরাও খাই। এই ছাতু খাবার উল্লাসে নাচতে থাকি সকাল থেকে।

শিবরাত্রিতে সিদ্ধেশ্বরী তলায় হয় মহা ধুমধড়াক্কা।

'সিদ্ধেশ্বরী তলা'—অতি পুরাতন এক অশত্থ বৃক্ষ। ডালে ঝুরিতে শিকড়ে মাটিতে জড়াজড়ি করা এর গুঁড়িটা। বিরাট গুঁড়ি। লোকেরা পুজো করে, তেল সিঁদুর মাখিয়ে দেয় গায়ে, দুধ ঢালে জল ঢালে গোড়ায়।

দিনে দিনে তেল সিঁদুর পড়ে পুরু হয়েছে প্রলেপ। কত খাদখন্দ, হস্তিমুণ্ড, শিবের জটা, মা কালীর চরণ— কত কিছু দেখা যায় এই সিঁদুর মাখা লাল গুঁড়িটাতে।

'সিদ্ধেশ্বরী তলা'র দেবী 'সিদ্ধেশ্বরী'— সকল কামনা সিদ্ধ করেন। আপদে বিপদে মানত করে লোকে; এসে পুজো দেয়।

শিবরাত্রির দিন মেলা হয় সিদ্ধেশ্বরীতলায়। জমিদার পাঁঠা বলি দেন। ঢাকী আসে, ঢুলি আসে, কাঁসর ঘণ্টা বাজে, মহা সোরগোল, লোকে লোকারণ্য। আশেপাশের সকল গ্রামের লোক আসে পুজো নিয়ে।

বাদাম ভাজা ছোলা ভাজা নিয়ে ডালা সাজিয়ে বসে বুড়ো দোকানী। গোলাপি রঙের চিনির তাল পাখা বিক্রি করে এক এক পয়সায় কালু ময়রা। লম্বা আঁশের মতো গুড়ের লাঠিটা কেটে কেটে দেয় ছোটোদের হাতে ময়রার ছেলেটা। একটা 'ডবল' পয়সা দিয়ে চারটা লাঠি পায়। এই শক্ত লাঠিটা চুষে খাবার লোভে ছোটোদের ভিড় হয় এখানেই বেশি।

দিদিমা মেলা থেকে আমাদের হাতে গালার চুড়ি পরিয়ে দেন, ফুকের দানার মালা কিনে দেন। আমরা চুড়ি মালা পরে চিনির লাঠি চুষতে চুষতে ভিড় দেখে বেড়াই সিদ্ধেশ্বরীতলার।

মা'দের আজ উপবাস; সিদ্ধেশ্বরী তলায়ই কাটিয়ে দেন সারাদিন। খাওয়া নেই, ঘরে ফেরার তাড়াও নেই।

এত যে উৎসব— এত হৈ-চৈ এখানে— আমার তবু বেশি ভালো লাগে 'বট-পাকুড়'-তলার পুজো দেখতে। সে পুজো হয় পৌষ-সংক্রান্তির দিনে। এই দিন বট-পাকুড়ের বিয়ের দিন— এদের প্রতিষ্ঠা-দিবস।

গ্রামের পুব দিকে উন্মুক্ত ক্ষেতের মাঝখানে বট-পাকুড়তলা। দুটি ছোটো চারাগাছ একসঙ্গে একই গর্তে লাগানো হয়েছিল প্রতিষ্ঠার দিনে। এই-ই সুশীলা পিসির প্রতিষ্ঠিত তলা। এখন এরা বয়সে তরুণ। এই বয়সেই অনেকখানি জায়গা ঘিরে একটি ছায়া ফেলেছে মাটিতে। অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গাঙ্গি, শাখে শাখে জড়াজড়ি, পাতায় পাতায় মাখামাখি— পরস্পরকে বেষ্টন করে দুটিতে এক।

বোঝা যায় না— কে যে কে। কেবল যখন পাতা ঝরে পড়ে তলায়, দুটি পাতা আলাদা হয়ে পড়ে। একটি গোলাকার পাতা— বটের, একটি পাতা সরু থুতির— অশত্থের।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন সুশীলা পিসি আসেন, গ্রামের গিন্নিরাও আসেন বউদের নিয়ে। পুব পাড়ার এঁরাই আসেন বেশি। মা-মামীরা আসেন। সকলেই আসেন এক-এক কলসি জল আর ডালাভরা পূজার সামগ্রী নিয়ে। এসে বট-পাকুড়তলার এক পাশে সব-কিছু নামিয়ে বসে যান পূজার আয়োজনে। মার কাছে বসে বসে দেখি। কলসির জল পিতলের গামলায় ঢেলে আতপ চাল ধুয়ে ফল কেটে নৈবেদ্য সাজান। থালার মাঝখানে আগে ভিজে আতপ চালের চুড়ো বানিয়ে একটা কাঁঠাল পাতা ভাঁজ করে মা তাই দিয়ে বুলিয়ে বুলিয়ে চুড়োর গা'টা মসৃণ করে তোলেন। একটি চাল বেকায়দায় থাকতে পায় না। এর পর চালের চুড়ো ঘিরে ফল সাজান। নানা রঙের নানা আকারে কাটা সে ফল— নানা ভঙ্গিতে রাখেন থালার উপর। সবশেষে চুড়োর উপরে চুড়ো তোলেন— ছোট্ট একটি ফাঁপা পানের খিলিতে ভুরা-চিনি চেপে চেপে জমিয়ে। চালের চুড়োর উপরে সেটি ধীরে আলগোছে বসিয়ে দেন।

যাঁর নৈবেদ্যের চুড়ো যত উঁচু যত সূক্ষ্ম হয়— তত তাঁর হাতের যশ। এ বাহাদুরি কেউ মুখ ফুটে বলে না বা নেয় না। মনে মনে থাকে— মনে মনে শেখে।

পেঁপের হলুদে, শশার সবুজে, নারকেলের সাদায়, খেজুরে কিসমিসে ডালিমের দানায় এক-একখানি নৈবেদ্যের থালা যেন রঙিন পাথর বসানো অলংকার এক-একখানি। রঙে নক্‌শায় ঝলমল করে।

একটি দুটি ঢাকী আসে, তারা বাজায়। একটা ছেলে কাঁসি পেটায়, পুরোহিত পুজো করেন— মেয়েরা শাঁখ বাজান— উলুধ্বনি দেন। স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে পুজোর আয়োজন হয়— পুজো শেষ হয়— প্রসাদ বিতরণ হয়।

'বট-পাকুড়তলা'র পুবে উত্তরে সর্ষে ক্ষেত। হলুদ রঙের সর্ষে ফুলে সোনা ঢেলে রাখে ভূমিতে।

ফিরবার সময় ইচ্ছে করে ক্ষেতের পথে নেমে পড়ি। সরু আলের উপর দিয়ে এক-এক করে পা ফেলে ফেলে পথ চলি। শিশির-ভেজা সর্ষে ফুলের ক্ষুদে ক্ষুদে সোনালি পাপড়িগুলি লেপ্টে লাগে পায়ের পাতার উপরে।

চৈত্র মাসে নীল পূজা। নীল পূজা— শিবের পূজা। এই পূজা দেখতে পাই নে আমরা। গ্রামের নমশূদ্ররা মিলে করে এই পূজা— তাদের নিজেদের পাড়ায়।

চৈত্রমাস পড়লে ছোটোমামাকে আর পাওয়া যায় না বাড়িতে। তিনি নীল পূজার গাজনে মাতেন। মা-মামারা রাগ করেন; কিন্তু যারা গাজনে মাতে— তারা সবাই ছোটোমামার অনুচর। মুরুব্বিকে নইলে জমে না তাদের।

মাস-ভর ছোটোমামা দলের সঙ্গে দিনে উপবাসী থাকেন, নিরামিষ খান, গায়ে তেল মাখেন না, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন।

গাজনের দল এ সময়ে বাড়ি বাড়ি আসে, সবাই মিলে তাণ্ডব নাচ নাচে, গায়। ছোটোমামাও সেইসঙ্গে থাকেন, দলের সঙ্গে নাচেন, গান; কেবল নিজ বাড়ির ধারে-কাছে আসেন না কখনো।

পাড়ায় গাজনের দল এসেছে, 'কালিকাচ' হচ্ছে— হরেক রকমের সাজ সকলের। ভূত-প্রেতও সেজেছে কেউ কেউ। গায়ে ভস্ম মাখা সবার।

মামীরা কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছেন— এবারে গাজনের আসল সন্ন্যাসীকে দেখতে পাবেন; কিন্তু আমাদের বাড়ির দু-তিনটে বাড়ির আগে হতেই পলকে ছোটোমামা উধাও হয়ে যান। কখন যান— কেউ ধরতে পারে না।

ছোটোমামা বাড়িতে ফেরেন চড়ক পূজার মেলা শেষ করে। আমাদের জন্য নিয়ে আসেন রঙিন কাগজের ফুল, শোলার টিয়ে পাখি, পয়সা জমাবার পেট ফাঁপা মাটির বুড়ো— আরো নানা জিনিস। বৌঠানদের জন্যও লুকিয়ে লুকিয়ে এনে দেন অনেক কিছু। মামীরা খুশি থাকেন ছোটো দেওরের প্রতি।

পাশের গ্রামেই হয় চড়ক পূজার মেলা। আমরা যেতে পাই না। কী নাকি মাতামাতি হয়— মারামারিও হয়।

গ্রামে 'মেলা' বলে না। বলে, 'বান্‌নী'। বলে, "যাবি না 'বান্‌নী'তে?" চৈত্র-সংক্রান্তির বান্‌নী থেকে মামারা ধামা ভরে ভরে কিনে আনেন চিনির 'মোঠ' আর ঢ্যাপের খই। এ দুটো জিনিস সবাই কেনে এই বান্‌নীতে।

চিনির 'মোঠ'—ছাঁচেঢালা চিনির ঘন রস জমানো সরু সরু ছুঁচোলো মন্দির। প্রিয়জন কি গুরুজনের চিতায় ছোট্ট মন্দির আকারে 'মোঠ' তোলে লোকে— সেই থেকেই নেওয়া এর নাম, এর গড়ন। এই গ্রাম থেকে দেখা যায় দূরে— 'সামসিদ্ধির মোঠ'। সামসিদ্ধি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন— তাঁর নামের মোঠ। সেও এই একই আকার।

আর আসে এইসঙ্গে কদমা, তিলা, পৈঁছি এক রাশি— সবই মিষ্টি।

ঢ্যাপের খই হল শাপলার বীজদানার খই। বীজগুলি রোদে শুকিয়ে রাখে, পরে খই করে। সরষের দানার মতো দানা, তার খইও হয় তেমনি। আঁজলা আঁজলা খই ঘন দুধে ফেলে মেখে দিতে না দিতে মিলিয়ে যায়।

১৭

মায়ের বাপের বাড়িতে প্রতিটি ঋতু আসে, এসে যেন দুহাতে বুকে জাপটে নিয়ে রাখে। এক পলকও ভুলতে দেয় না তাদের উপস্থিতিটা।

বৈশাখ মাসে কাঁচা আমে আঁঠি শক্ত হবার আগেই ঝড়-তুফানের দিন শুরু হয়ে যায়। এই তুফানের দিন— বড়ো ভীষণ দিন।

এই সময়ে আমাদের রাত্রের খাওয়া-দাওয়া বিকেল বিকেলই সেরে ফেলতে হয়। দিদিমা উঠোনময় ঘুরে বেড়ান, বাইরে আনাচে-কানাচে কোথায় কি পড়ে আছে দেখে ঘরে তোলেন। আকাশের কোণে কোণে তাকান, আর সবাইকে তাড়া দেন— তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে হাতমুখ ধুয়ে শোবার ঘরে ঢুকবার জন্য। শোবার ঘরগুলি বেশি মজবুত। —এ সময়ে অন্য-সব ঘরে থাকা নিরাপদ নয়। বাইরে চলাফেরা বা ঝড়ের মুখে উঠোন পার হওয়া বিপজ্জনক। তুফানে চালের টিন উড়ে যায়, ঘরের বেড়া উড়ে যায়— কত কী হয়। গত বছরে এমনি সময়ে পাশের গ্রামে কী বিপদটাই ঘটল। রান্নাঘরে বউ ছিল, তুফান আসতে তাড়াতাড়ি উঠোন পেরিয়ে শোবার ঘরে আসছে— রান্নাঘরের চালের টিন উড়ে এসে বউয়ের কোমরের মাঝখান দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল। দু-আধখানা হয়ে বউয়ের দেহ উঠোনে গড়াগড়ি দিল।

আকাশে মেঘ না কিছু না— হঠাৎ এ-কোণ ও-কোণ থেকে শোঁ শোঁ করে হাওয়া ছুটে আসে। কী তার গতি— কী তার গর্জন! মুহূর্ত সময় দেয় না সাবধান হতে। ঘরের টিনের চাল কট্‌কট্ করে ওঠে, বেড়াগুলি থরথর করে কাঁপে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে বজ্রবিদ্যুৎ বৃষ্টি।

এক-একদিন এমনি ভয়ংকর মূর্তি ধরে তুফান— মনে হয় পুরো ঘরখানাই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে চলল। মনে হয় মাটির ভিতটাও কাঁপছে এইসঙ্গে।

দিদিমা আমাদের ছোটোদের খাটের নীচে পালঙ্কের নীচে ঢুকিয়ে দেন। চাল যদি বা ভেঙে পড়ে— ঘরচাপা পড়ব না আমরা। বলেন— 'হরিবোল হরিবোল বলো'।

আমরা খাটের নীচে ঘাড় গুঁজে বসে বড়ো বড়ো চোখে বড়োদের দেখি, আর জোরে জোরে বলি— 'হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল'। ভয়ে কাঁপি।

বেড়া বুঝি থাকে না এ যাত্রা।

মামারা ঘরের চার কোণার বেঁড়ার বাঁশ গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টেনে ধরে থাকেন। কখনো বা বেতের গোছা দিয়ে ভিতর থেকেই থামের সঙ্গে বেড়া আরো শক্ত করে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধেন।

বাইরে শব্দ শোনা যায়— মট্‌মট করে গাছ ভেঙে পড়ছে। ডালে ডালে ডাল আছড়াচ্ছে। টিনের চালে বৃষ্টির ঝাপ্‌টা, হাওয়ার দাপট, বজ্রের কড়কড়ানি— সব মিলিয়ে এক বিভীষিকাময় ত্রাসের সঞ্চার করে ঘরে।

তুফানের সময়ে সকলে এক ঘরে থাকি। কোনোদিন অল্প রাত্রেই তুফান থামে, কোনো-কোনোদিন রাতভরই তুফান চলে।

ভোরবেলা বাইরে এসে দেখি নির্মল নীল আকাশ আলো ঢেলে হাসছে। এত যে কাণ্ড হয়ে গেল রাত্রিকালে— কোনো দাগ নেই সেখানে। কেবল উঠোন-ভরা থেঁতলানো পাতা, ভাঙা ডাল, বাঁশ খড়— সারারাত্রের দাপাদাপির চিহ্ন পড়ে আছে মাটিতে।

দু দণ্ড বেলা চলে যায় এ-সব পরিষ্কার করতে। দেখতে দেখতে কড়া রোদ ওঠে, উঠোন শুকোয়, ধান চাল রোদে পড়ে; বিকেল পর্যন্ত আবার সারা বাড়ি ঝক্‌ঝক্ করে।

বিকেলে বেড়ার গায়ে ঝিঙে ফুল ফোটে, দিদিমা আবার তাড়া দেন বউদের সব কাজ সেরে ঘরে ঢুকতে। মামীরা দুদ্দাড় করে কাজ সারেন। মামারাও এক-একখানা হাত-দা, এক গোছা বেত, আর কিছু 'তার' হাতে নিয়ে ঢোকেন দক্ষিণের ঘরে। আর-একটা তুফানের জন্য বসে থাকেন তৈরি হয়ে।

একদিন এইরকম তুফানের দিনে ঘরের চাল ধরে রাখা যায় না যখন আর— ছোটোমামা হুংকার দিয়ে উঠলেন সবাইকে— 'শিগ্‌গির সকলে ঢোকো খাটের নীচে। চাল কাটতে হবে এক্ষুনি'।

ছোটোমামা হাত-দা হাতে লাফিয়ে উঠে গেলেন 'কার'-এ। যে তার দিয়ে থামের সঙ্গে চাল বাঁধা, সেই তারগুলি কেটে ফেলবেন। পড়ে পড়ুক শুধু চালাটাই পড়ুক উড়ে। নয়তো যা ঝড়ের রকমসকম— বেড়া থাম সব উপড়ে নিয়ে পুরো ঘরটা সমেত উড়ে পড়বে চাল। এ অবস্থায় ঘরচাপা পড়বে ঘরের সবকটা মানুষ।

ছোটোমামা কোপ বসাবেন তার-এ— এমন সময়ে মেজোমামা ডেকে উঠলেন— 'ওরে গণশা— গণশা রে, থাম থাম। চালের ওপরে যেন মোটা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল— শুনলাম।'

মোটা বৃষ্টি শুরু হলে আর ভয় নেই। বৃষ্টি-ভাঙা বন্ধ হল, হাওয়া এবারে শান্ত হবে।

ঝড়ের মুখে বৃষ্টির ধারা মাটিতে পড়বার আগেই ধুলো হয়ে গুঁড়িয়ে যায় হাওয়ার তোড়ে। শন্‌শন্ শোঁ শোঁ আওয়াজই হয় তখন কেবল। শুধুই জলের ঝাপ্‌টা আর আছাড়িবিছাড়ি।

বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ যেই উঠল টিনের চালে, সবাই আশ্বস্ত হলেন। ছোটো মামাও নেমে এলেন নীচে।

এরকম ভীষণ তুফান আসে ক্বচিৎ কখনো বছরে। খুবই ভয় পেয়েছিলাম আমরা সবাই।

দিনের বেলাও দু-একটা ঝোড়ো হাওয়া আসে, তা আসেই কালবৈশাখীতে। এই ঝড়ে আমাদের মজাই হয়— কাঁচা আম কুড়োই। কিন্তু নিয়ম করে এই যে বিকেল হতেই ঝড় আসা— এর নাম তুফান। তুফানের রূপ বড়ো ভয়াল— বড়ো ভয়ংকর। এই তুফানে কত লোকের ঘর পড়ে যায়, কত লোক জখম হয়। কত নৌকাডুবি হয় নদীতে— বিলে।

কতরকম খবর আসে চারি দিক থেকে দিনে দিনে। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি তুফানের কালে।

গ্রীষ্ম কাটে। আকাশে বর্ষার মেঘ দেখা দেয়। বাড়িতে বাড়িতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই। কে জানে কতটা জল বাড়বে এবারে।

মামীরা জ্বালানির কাঠ রান্নাঘরের মাচায় সাজিয়ে রাখেন। সারি সারি পাকা কুমড়ো শিকেয় ঝোলান। বর্ষায় হাটবাজার বসে না ঠিকমতো; জলে ডুবে যায় ক্ষেত-খামারের মাটি। এই কুমড়োই বর্ষার প্রধান সবজি।

ভাঁড়ারের চাল ডাল আচার আমসি আমসত্ত্ব বড়ি— রোদ দেখিয়ে রাখা হয়। কি জানি কতদিন জল থাকবে থিতিয়ে। রোদে সব জিনিস আর-একবার শুকিয়ে না নিলে ভিজে হাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাবে।

দিদিমা পাটশল্‌মির কাঠি গরম গন্ধকে ডুবিয়ে গোছা বেঁধে রাখেন। কোনো 'মার্কা' দেশলাই-ই জ্বলে না তখন এই জলে। সে সময়ে এই পাটকাঠির দেশলাই একমাত্র ভরসা। মালসা-ভরা তুষের আগুন জিইয়ে রাখা হয় সকল গৃহস্থ ঘরেই। এই কাঠি দিয়ে সেই তুষের আগুনের মালসায় আগুনটা একটু খোঁচালেই গন্ধকটা জ্বলে ওঠে। উনুন ধরানো, প্রদীপ লণ্ঠন জ্বালানো— সব-কিছু হয় তখন এই কাঠির আগুনে।

দাওয়ার চার দিকে মাটি ফেলানো হল আরো খানিকটা। আকাশ দেখেই বুঝতে পারছেন মামারা জলের ধাক্কা বেশি হবে এবারে। ভিতের মাটি কেটে নিয়ে যেতে পারে ধারে ধারে।

ছোটোমামা সব কাজ ফেলে তাঁর নৌকোখানা নিয়ে মেতে উঠলেন। পুকুরের জলে ডোবানো থাকে উন্‌নার দিনে, সেই নৌকো তুলে এনে রেখেছিলেন তুলসীমণ্ডপের উঠোনে। এখন উঠে-পড়ে গাবের কষ লাগাতে লাগলেন তাতে।

দিনকয় আগে কয়েক ঝুড়ি কাঁচা গাব ঢেঁকিতে কুটিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিল মাটির চাড়িতে করে। গাবের কষে তৈরি সেই জলে চটের টুকরো ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছোটোমামা তাঁর সঙ্গী সাথি নিয়ে নৌকোয় মাখাচ্ছেন আর শুকোচ্ছেন; শুকোচ্ছেন আর মাখাচ্ছেন। আর থেকে থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে দেখছেন।

নৌকোটাকে উল্টেপাল্টে কাত করে উপুড় করে গাবের কষ মাখানো হল। এ কয়দিন ছোটোমামার মেজাজই অন্যরকম। আমলই দেন না আমাদের।

মামীরা বলেন— 'হুঁ, নৌকো তো নয়, যেন অরক্ষণীয়া কন্যা ছোট্ রায়ের। হলুদ জলে স্নান করাচ্ছেন মেয়ের রূপ খোলাতে।'

গাবের কষে শক্ত পোক্ত হয় কাঠ। গাবের কষ মাখানো হলে নৌকোটা দক্ষিণ দিকের ঢালু পথের ধারে বোন্না গাছটার তলায় নিয়ে রেখে দিলেন। নতুন জলটা এ পর্যন্ত উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নৌকো ভাসাতে পারবেন জলে।

মামারা সকলেই ব্যস্ত কাম্‌লা-মজুর নিয়ে। প্রথম কাজ সাঁকো বাঁধা।

হাতের দা থামে না কারো। বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে আনা হচ্ছে, বাঁশ কেটে দু খানা করা হচ্ছে, বাঁশ চিরে দু ফালি চার ফালি করা হচ্ছে। এতক্ষণে ছোটোমামাও এসে হাত লাগান এ কাজে।

বিভিন্ন দিকের ঘরে আসা-যাওয়ার জন্য জোড়া বাঁশের সাঁকো বাঁধা হল উঠোনের উপরে। এই সরু সাঁকোর উপর দিয়ে চলতে গেলে ধরতে হয় কিছু। লম্বা লম্বা বাঁশ বাঁধা হল পাশে পাশে উঁচু খুঁটির উপরে।

নতুন বাঁধা সাঁকো— আমরা এক হাতে বাঁশ ধরে পা টিপে টিপে চলি সাঁকোর উপরে। মামারা বলেন— 'ও ভাবে নয়, লাফালাফি কর ওর ওপরে।'

আমরা এবার দু হাতে বাঁশ ধরে লাফালাফি করি, বাঁশ ঝাঁকাই।

মামারা খুশি হন। বলেন, 'হ্যাঁ, মজবুত হয়েছে বাঁধন।'

উঠোন-জোড়া সাঁকো বাঁধা হয় জল আসার আগেই। জল উঠোনে ঢুকলে তখন কলাগাছ কেটে ভেলা বানাবেন। জিনিসপত্র নিয়ে রান্নাঘরে যাওয়া আসা ভেলাতে করেই সুবিধে।

আর— নৌকো তো তৈরিই আছে ছোটোমামারটা ছাড়াও একটা— এ বাড়ি ও বাড়ি, হাটবাজার, চকবিল— এদিক ওদিক যাবার জন্যে।

গাঙের জল খানিকটা খালে ঢুকে নৌকোর পথ করেই রাখে বারো মাস; তবু হঠাৎ একদিন খবর আসে— গাঙের জল খালে ঢুকেছে। মানে— নতুন জল এসেছে। এ খালটা সেই বাবন খাঁ চাচার খাল।

হৈ হৈ করে খবরটা রটে যায় গ্রামে। সারা গ্রামটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, লোকজন ছুটোছুটি করতে থাকে। ঘোষের বাড়ির খালের ধারে দু পাড়ার লোক এসে ভিড় করে। এই পথেই গাঙের জল প্রথম এসে ঢোকে গ্রামে।

তরুণরা ছোটে গাঙের মোহানায়, জলের অবস্থাটা দেখতে। তারা খবর আনে কাল কি পরশুর মধ্যেই জল এসে পড়বে ঘোষের বাড়ির খালে। মা-দিদিমারা এ খবর শোনেন শুকনো খালের ডাঙায় দাঁড়িয়ে। আমরা পথের এ মাথা ও মাথা ছুটোছুটি করি—যেন কী একটা মজার জিনিস ঘটতে চলেছে শিগ্‌গিরই এখানে।

—'নতুন জল আসছে, নতুন জল আসছে' —সবখানে শুধু এই রব।

নতুন জল এসে গেল।

ভোর না হতে খবর এল ঘোষেদের খালে এসে ঢুকেছে জল।

ছুটলাম— ছোটোবড়ো সকলে। হুম্ হুম্ করে ঢুকছে জল। কল্‌কল্ করে ভরে উঠছে খাল।

খাল ভরল। ভরা খালের জল দক্ষিণের বাঁক ঘুরে নন্দীবাড়ির ঘাট্‌লার পুকুরে এসে ঢুকল। জলের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও ছুটে এলাম ঘাট্‌লায়।

নন্দীদের পুকুর ভরল। জল সিঙ্গিবাড়ির খালপথ ধরে নয়াবাড়ির পুকুরে গেল। নন্দীবাড়ির নয়াবাড়ির দুই পুকুর ভরে পুকুরের পাড় ভাসিয়ে দক্ষিণ দিকটা ডুবিয়ে দিয়ে জল চলে গেল সিদ্ধেশ্বরীতলার দিকে।

এদিকে পূর্বপ্রান্ত অবধি বিল ভরে উঠেছে জলে— বিলের জলে খালের জলে মিলে গেল এক হয়ে।

এখন এই জল দিনে দিনে বাড়তে লাগল। মাঠ ডুবল, ঘাট ডুবল— গ্রামের সকল রাস্তা ডুবল। জল এসে ডাঙায় উঠল। ডাঙা থেকে বাড়ির সীমানায় এল। সীমানা থেকে চলে গেল একদিন অন্দরমহলে— বাড়ির ভিতরের উঠোনে। যেন ছুটে ছুটে এল জল।

এই দেখি জল ঐখানে, দিদিমাকে হাঁক দিই— 'ও দিদিমা গো, মান্দারতলায় জল এসে গেল গো।'

দিদিমা বলেন— 'কাঠি পুঁতে দে। কতক্ষণে কতটা এগিয়ে আসে দেখ।'

কাঠি পুঁতে দিয়ে দিদিমাকে এসে খবরটা দিতে না দিতে জল এগিয়ে আসে আরো এক হাত। জল উঠোনে উঠল। চার আঙুল উঠল, গোড়ালি ডুবল, হাঁটু ডুবল— কোমর অবধি উঠল জল। জলের কলকলানি থামল।

দিদিমা আমাদের টেনে টেনে দাওয়ার উপরে বসিয়ে রাখলেন। মামারা বই কাগজ নিয়ে খাটে উঠলেন। মা কাঁথায় টানা দিতে বসলেন। মামীরা ঘরকন্নায় মন দিলেন। চার দিকে স্থির-জল স্থির হয়ে রইল।

জলের ঘটনাটা যেন দেখতে দেখতে ঘটে গেল। মাত্র দিনকয়েকের ঘটনা। এ কয়দিন জল ছাড়া আর নজর ছিল না কারো কোনোদিকে। জল আসছে— আসছে, এল— এল, এতটা ডুবল— অতটা উঠল— এই শুধু কথা সকলের মুখে। দিদিমা ভয়ে ভয়ে ছিলেন না-জানি এবার কোন্ পর্যন্ত ওঠে জল। এখন সবাই জানলেন— যতটা উঠবার উঠে গেল এবারকার মতো। দিদিমা নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন এতক্ষণে।

দাওয়ার উপর বসে থাকি। চার দিকে জল আর জল। উত্তর দিকে ঘরের পিছনে বেতঝোপ ঘিরে জল চিক্‌চিক্ করে— অর্ধেক ঝোপ জলের তলে— অর্ধেক উজ্জ্বল সবুজ রঙ নিয়ে উপরে লুটোপুটি খায়। মোত্রাবন ডুবে ডুবে স্নান করে আর মাথা তোলে। বাঁশের ঝাড় বুকজলে জল-ছোঁড়াছুঁড়ি খেলা করে।

পুবে দক্ষিণে পশ্চিমে আম জাম হিজল গাব বোন্না মাদার আমলকী চালতা— সব গাছগুলির কোমর দু'হাতে জড়িয়ে বেষ্টন করে আছে সাদা জল। সকল সবুজের ফাঁকে ফাঁকে এই রুপোজল হাসে দিকে দিকে। দু চোখ মেলে তাই দেখি।

রাত্রে দিদিমার পাশে শুয়ে তাকিয়ে থাকি জালি-জানালা দিয়ে। সাদা আকাশটা দেখি। চার দিক থেকে ঝিঁঝি পোকা ডাকে। এই ডাক এক

সময়ে এক হয়ে মিলে অতি নিকটে চলে আসে। চোখ বুজে দিদিমার দিকে পাশ ফিরি।

ছোটোমামা ঘরে বসে থাকতে পারেন না— নৌকোখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে তাঁর নৌকোয় উঠে পড়ি; মধ্যিখানের পাটাতনটায় বসে বাটি দিয়ে নৌকোর জল তুলে তুলে জলে ফেলি। যেন এই কাজটির জন্য আমাকে নেহাতই প্রয়োজন ছোটোমামার— এমনিই ভাব দেখাই।

এক-একদিন ছোটোমামা শাপ্‌লা তুলতে যান। এদিন আমার আনন্দ সবচেয়ে। গোলাপি রঙের শাপ্‌লাগুলি তখনো পাপড়ি মেলে ফুটে থাকে জলের উপরে। শত সহস্র শাপ্‌লা আলো করে রাখে বিলের এ ধারটা। ছোটোমামা শাপ্‌লা তোলেন একটা একটা করে। এক-একটা শাপ্‌লা পাঁচ-ছয় হাত লম্বা।

নৌকো বোঝাই হয়ে যায় শাপ্‌লায়। ছোটোমামা লগি ঠেলে ঠেলে নৌকোটাকে যখন ঢোকান শাপ্‌লা বনে— পাগল হয়ে উঠি ফুলগুলি ধরবার জন্যে। একবার নৌকোর এপাশ দিয়ে, আবার নৌকোর ওপাশ দিয়ে হাত বাড়াই। দিশে পাই না কাকে ধরব— ক'টাকে ধরব।

ছোটোমামা কখনো কম কিছু করতে পারেন না। শাপ্‌লা তুললেন তো নৌকো বোঝাই শাপ্‌লা এনে ফেললেন। মা-মামীরা সবাই বসে যান শাপ্‌লা ছাড়াতে। শাপ্‌লার গায়ে সুতোর মতো আঁশের আবরণ থাকে, টেনে টেনে ছাড়াতে হয়। এদিন রান্নাঘরে শাপ্‌লারই সব ব্যঞ্জন হয়। শাপ্‌লার শুক্তো, ডাল, ঘণ্ট, টক, আর হয় শাপ্‌লার ভেলা ভাজা। ঘণ্টের শাপ্‌লা কুচি কুচি করে কাটতে হয়। তা ছাড়া আর-সব ব্যঞ্জনের শাপ্‌লা যেটার যে মাপ— ভেঙে ভেঙে নিলেই হল। ভেলা-ভাজার শাপ্‌লাগুলিও হাতের পাঞ্জার আকারে এক মাপে ভেঙে সাত-আটখানা পাশাপাশি সাজিয়ে দু পাশে দুটো কাঠি গুঁজে আটকে দিয়ে পিটুলি গোলায় ডুবিয়ে ভাজতে হয়। ছোটো ছোটো ভেলার মতোই দেখতে হয় তখন। ভেলায় কাঠি গাঁথবার কাজে আমরাও লাগি। খুব আগ্রহ নিয়েই করি এ কাজ।

আর— আপন শখে আপন মনে বানাই লম্বা লম্বা শাপ্‌লার মালা। এ মালা করতে সুঁচ লাগে না সুতো লাগে না। একটা শাপ্‌লা হাতে নিয়ে এর এই দিকটা একটু ভাঙি, আর-একটু আঁশ টানি; ঐ দিকটা একটু ভাঙি— আঁশ টানি। টুকরো টুকরো শাপ্‌লাগুলি এক-একদিককার আঁশে আটকে থাকে। একটু আঁশ একটু শাপ্‌লা— এইভাবে দুটো নাল তৈরি হয়ে যায়। ভাঙতে ভাঙতে ফুল পর্যন্ত আসি যখন তখন মস্ত এক মালার মাঝখানে শাপ্‌লা ফুলটি ঝোলে 'লকেট' হয়ে।

এই মালা গলায় পরি, মাথায় জড়াই, হাতের বালা-বাজু করি; শাপ্‌লার অলংকারে সারা অঙ্গ ভরে ফেলি।

বর্ষাকালটায় বাইরে ঘোরাঘুরি বন্ধ থাকলেও বৈচিত্র্য থাকে কত।

এই সময়েই নৌকো করে আসেন বড়োমামীমার গুরুদেব।

বড়োমামীমা দু বছর আগে 'বেশ' পরিবর্তন করেছেন। সেবারে মা যখন এলেন বড়োমামীমা কেঁদে পড়লেন। বললেন, 'আর আমাকে বাধা দিবেন না।'

নিরুদ্দিষ্ট লোকের জন্য চৌদ্দ বছর অপেক্ষা করে কুশপুত্তলিকা দাহ করার নিয়ম। অর্থাৎ সে ব্যক্তি তখন মৃত বলে স্বীকৃত হলেন। বড়োমামা নিরুদ্দেশ হয়েছেন— দুই চৌদ্দ পেরিয়ে গেছে।

মামারাই সব আয়োজন করলেন। কুশপুত্তলিকা দাহ করা হল। বহুকাল আগের ভাই, এরা তখন ছোটো ছোটো, বড়ো ভাইয়ের স্মৃতিও সবার অস্পষ্ট। হাসতে হাসতেই করলেন এ কাজ— যেন একটা মস্ত রসিকতা করছেন বড়ো বোঠানের সঙ্গে— এমনি ভাব। বড়ো বোঠানের চোখে জল নেই দেখে কত হাসাহাসিও করলেন তাঁকে নিয়ে।

সেই বড়োমামীমা যখন হাতের শাঁখা ভেঙে স্নান করে থানধুতি পরে এসে দাঁড়ালেন— মামারা চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

সেই বছরেই কুলগুরুকে আহ্বান করা হল। মহা ঘটা করে তাঁর কাছে বড়োমামীমা মন্ত্রদীক্ষা নিলেন। এই উপলক্ষে বাড়িতে উৎসব পড়ে গেল কয়দিন।

সেই থেকে বড়োমামীমার গুরুদেব বছরে একবার করে শিষ্যবাড়ি আসেন। বর্ষাকালে নৌকো নিয়ে বের হন, যে গ্রামে যত শিষ্য আছে— বাড়ি বাড়ি গিয়ে দু-চারদিন করে থাকেন।

ফরসা গোলগাল বৃদ্ধ পণ্ডিত; ইনি এলে আমাদেরও খুব আনন্দ হয়। বড়োদের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমাদেরও কত পুরাণ কাহিনী শোনান। স্তব স্তোত্র শেখান।

সব গুরুরাই একজন সেবক-শিষ্য সঙ্গে আনেন, বিশেষ করে কায়স্থ শূদ্র শিষ্যের বাড়িতে যখন আসেন।

বড়োমামীমার গুরুদেবের সঙ্গেও আসেন একজন ব্রাহ্মণ সেবক। ভোগ রান্না করেন। এ কয়দিন আমিষ-ঘরের দরজায় শিকল তোলা থাকে।

নিরামিষ ঘরে প্রচুর রান্নার ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণ রান্না করে পিতলের বড়ো বড়ো গামলায় সব ঢেলে ঘরের মেঝেতে সাজিয়ে রাখেন। গুরুদেব 'ভোগ

নিবেদন' করেন। তাঁর খাওয়ার পর ছোটো বড়ো সকলে সারি দিয়ে খেতে বসি। আত্মীয়-প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ থাকে— এক-একদিন এক-এক দলের।

ভোর হতে যেন উৎসব চলে একটি বৃদ্ধকে ঘিরে।

তার পর যেদিন গুরুদেব চলে যান সেদিন যেন সব ফাঁকা হয়ে যায়।

শাঁখারীর নৌকো আসে গ্রামে, ছোটো ছোটো টিনের বাক্স-ভরা শঙ্খের শাঁখা নিয়ে। বাড়ি বাড়ি নৌকো নিয়ে যায়— সধবাদের নতুন শাঁখা পরায়।

শাঁখারীর নৌকো চলে আসে একেবারে উঠোনের উপরে। সামনের গলুইটা এসে ঠেকে দাওয়ায়। দাওয়ার থামের সঙ্গে নৌকোটা বাঁধে শাঁখারী।

বিধবা সধবা কুমারী বুড়ি— সকলেই সমান উৎসুক। সবাই এসে ঝুঁকে পড়ে নৌকোর উপরে।

কতরকমের শাঁখা। শঙ্খলতা শাঁখা, কল্‌মিলতা শাঁখা— কাটা বরফি, মিছরিদানা, লিচু কাটা, ধান ছড়ি— নানা নক্‌শা-তোলা নানা নামের শাঁখা।

দুদিকে 'পল' তোলা সাদা শাঁখা পরতেন বড়োমামীমা বরাবর। ঐটিই ছিল তাঁর পছন্দের। মেজোমামীমার সখ 'ধান ছড়ি' নকশার। অন্য মামীরা প্রতি বছর পছন্দ বদলান।

শাঁখারী টিনের বাক্সগুলি বের করে সারি সারি ডালা খুলে ধরে। এক-একটা বাক্স খোলে আর শুভ্র শাঁখাগুলি ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে।

এবারের নতুন ফ্যাসানের শাঁখা— শাঁখার চুড়ি। সরু সরু চারগাছি করে চুড়ি— এক-এক হাতের জন্য।

কাজকর্মের হাতে মোটা শাঁখাই ভালো। ভাঙবার ভয় কম। কিন্তু শাঁখার বেলায় 'না' বলতে নেই কাউকে।

শাঁখা হাতে পরবার সময়ে ভেঙে গেলে মন খুঁতখুঁত করে। অমঙ্গল মনে হয়। ঢিলে মাপের শাঁখায় চোট্‌ লাগে চট্‌ করে, ভেঙে যায় দেখ্‌-না-দেখ। অদিন অক্ষণে হাতের শাঁখা ভেঙে যাওয়া— এও অমঙ্গল।

শাঁখারীরা শাঁখা পরাতে ওস্তাদ। হাতটা টিপে টিপে এমন করে শাঁখা পরায়— ঠিক মাপে মাপে হয় শাঁখা— ঢলঢল করে না হাতে।

মামীরা ঘোমটা টেনে এক-একজন করে হাত বাড়িয়ে দেন। শাঁখারী এক বছরের পুরোনো মলিন শাঁখা খুলে দিয়ে নতুন শাঁখা পরিয়ে দেয়। শাঁখা হাতে দিয়ে মামীরা মা দিদিমা গুরুজনদের প্রণাম করেন। তাঁরা মামীদের হাত নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শাঁখা দেখেন, দেখে খুশি হন।—হ্যাঁ, ঠিক মাপেই হয়েছে, হাতে শাঁখা ঘোরে, অথচ গা ছুঁয়ে থাকে।

শাঁখা পরা শেষ হতে পুরো একবেলা কেটে যায়।

দিদিমা দাওয়ায় আসন পেতে পাথরের থালায় মুড়ির মোয়া, নারকেল নাড়ু, ক্ষীর, কলা, খইয়ের উখ্‌রা সাজিয়ে খেতে দেন শাঁখারীকে। শাঁখারী খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে আবার জলে নৌকো ভাসায়, আর-এক বাড়ির উঠোনে গিয়ে নৌকো বাঁধে।

কুমারী মেয়েরা শাঁখা পরার অধিকারী নয়। আমরা পাই শাঁখের আংটি। ছোটো ছোটো দুটি আংটি পেলে মনে করি একটা সম্পত্তি হল আমাদের।

একবার শাঁখারী শাঁখের 'লকেট' বানিয়ে আনল। সোনার হারে সে 'লকেট' বসিয়ে আমাদের আনন্দের অবধি রইল না।

বর্ষাকালে স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর আসেন বড়োমামীমার পাঠশালা দেখতে। উন্‌না-কালে মাঠ ক্ষেত দিয়ে হাঁটা পথে আসতে কষ্ট অনেক। বর্ষাকালে শুয়ে বসে পথ পার হওয়া যায় নৌকোতে করে।

এই সময়ে ইন্‌স্পেক্টরবাবু গ্রামে গ্রামে স্কুল পরিদর্শন করেন।

ইন্‌স্পেক্টর এক গ্রামে এসে ঢুকলেই তার পাশের গ্রামে খবর চলে যায় তক্ষুনি। সঙ্গে সঙ্গে গুরুমা, গুরুমশাই, পড়ুয়ার দল সবাই তৈরি হয়ে যায়।

নন্দীবাড়ির নিমাই গিয়েছিল পাশের গ্রামে মুদির দোকানে জিনিস কিনতে। সেখানে ইন্‌স্পেক্টরের নৌকো দেখেই সওদা কেনা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি বৈঠা বেয়ে ফিরে চলে এল। এসে খবরটা দিল। বলল, 'ইন্‌স্পেক্টর এসেছেন দেখলাম, ঐ গ্রাম সেরে দুপুর নাগাদ এখানে এসে পড়বেন বলে মনে হয়। শিগগির তৈরি হন আপনারা।'

তৈরি হওয়া মানে অনেকখানি ব্যাপার। বর্ষাকালে বড়োমামীমার পাঠশালা বলতে গেলে বন্ধই থাকে। জলের জন্য আসা-যাওয়ার অনেক অসুবিধে পড়ুয়াদের। নৌকোয় করে বাড়ি বাড়ি থেকে তুলে আনা তাও সম্ভব নয়। আনতে নিতেই দিন কাবার হবে— পড়বে কখন? তা ছাড়া কে আনে, কে পৌঁছে দেয়— মহা হাঙ্গামার ব্যাপার।

তবে, আজকের কথা আলাদা। ইন্‌স্পেক্টর আসছেন খবর পেয়ে ছোটোমামা নৌকো নিয়ে বের হলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে যত পারলেন ছেলেমেয়েদের এনে জড়ো করতে লাগলেন। তারা আজ তোলা জামাকাপড় পরে, চুলে তেল দিয়ে, সিঁথি কেটে— মেয়েরা লাল রিবন মাথায় বেঁধে পাঠশালা ঘরে ভিড় করে বসল। এদিন অনুপস্থিত থাকে না বড়ো কেউ। যারা কখনো আসে না— তারাও আজ এল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবুর জন্য জল-খাবার করতে হবে। এইটে একটা বড়ো কাজ। আজ আর নাড়ু- মোয়ায় চলবে না। পড়শিরা আসেন ভিড় করে— কেউ সাহায্য করতে, কেউ দেখতে। এক বাড়িতে পাঁচজন জুটলেই তা দেখবার মতো ব্যাপার।

সুন্দর বোঠান ছুটে আসেন সকলের আগে। এসে ময়দা মাখতে বসেন।

ইন্‌স্পেক্টরের জন্য পোশাকি জল-খাবার হয়— লুচি হালুয়া।

বড়োমামীমা ছাত্রছাত্রীদের বেঞ্চির উপরে সারি সারি বসিয়ে দেন। তেঠেঙ্গা টেবিলটার উপরে খাগের কলম কালির দোয়াত আর খাতাটা রেখে চশমাটা চোখে বেঁধে নিজেও তৈরি হয়ে থাকেন।

সুবোধ সুশীলা ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে একটানা নামতা পড়তে থাকে— দুই দুকুনে চার, তিন দুকুনে ছয়— দশ দুকুনে কু-ড়ি।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু পাঠশালা ঘরে ঢোকেন।

এ বছর বড়োমামীমা আমাকেও বসিয়ে দিলেন বেঞ্চিতে পড়ুয়াদের সঙ্গে। আমি এদের সবার বড়ো, এদের চাইতে বড়ো বই পড়ি। ইন্‌স্পেক্টরবাবু খুশি হয়ে গুরুমার মাইনে আরো চার আনা বাড়িয়ে দিলেন। তখনি তখনি এর ব্যবস্থা করে দিলেন।

এই সময়ে ঘটকের নৌকো আসে গ্রামে পাত্রপক্ষ নিয়ে পাত্রী দেখতে। একদিন আমাদের বাড়িতেও এলেন। দিদি এখনো ছোটো, তবু দেখিয়ে রাখতে দোষ কি? মুখে মুখে বার্তা চালু থাকবে— 'অমুক গ্রামে অমুক বাড়িতে পাত্রী আছে একটি'।

দিদিকে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে দেখানো হল পাত্রপক্ষকে। আমি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলাম দিদিকে— আর-একদল ভদ্রলোককে।

বর্ষাকালে প্রতিটি বাড়ি দ্বীপের মতো আলাদা আলাদা হয়ে থাকলেও একে অন্যের বাড়ির খবর জানতে দেরি হয় না মোটে।

ও পাড়ায় উলুধ্বনি পড়ল। মা দিদিমা সজাগ হলেন।

মা বললেন, "কার বাড়িতে জোকার পড়ল গো মেজোবউ?"

দিক অনুমান করে মামীমা বললেন, "মনে হয় মিত্তির বাড়িতে।"

দিদিমা বললেন, "তবে বুঝি 'পাঁচকইড়া'র বউ-এর ঘরে কিছু হল।"

মামীমা ততক্ষণে গুনতে লেগেছেন কয় ঝাঁক উলুধ্বনি পড়ল। বললেন, "সাত ঝাঁক।"

বেজোড় সংখ্যা— তবে ছেলে হয়েছে বউ-এর। মেয়ে হলে হত জোড় সংখ্যা।

এইরকম একদিন আমাদের বাড়িতে উলুধ্বনি পড়ল। বর্ষাকালে জলে ভরা দিক, জলের উপর দিয়ে সে ধ্বনি কল্‌কল্‌ করে গেয়ে উঠল।

মামাদের সঙ্গে মামলা চলছিল নন্দীদের, দু-পুরুষ ধরে। এক ফালি জমি নিয়ে মামলা। দাদামশায়ের আমলে কোন্‌ এক শরিক লুকিয়ে জমির অংশ বেচে দিয়েছিল নন্দীদের কাছে। বসতভিটার জমি— তেমন আইনসংগত ছিল না ব্যাপারটা। অধিকার ছাড়বেন না মামারা— নন্দীরাও না।

মকদ্দমা চলতে লাগল। দু পক্ষই কোর্টে যান নিয়মিত। মামারা একজন পালা করে গ্রামে থাকেন শুধুমাত্র এই কাজের জন্যই। মামীদের দু-চারখানা অলংকারও গেল মকদ্দমার ব্যয় বহন করতে।

এতদিনে সেই মামলার রায় বের হল— জয় হয়েছে মামাদের। দু বাড়ির লোকই গিয়েছিল সদরে, চিনিমামা আগে এসে পৌঁছলেন জয়ের খবর নিয়ে। অতি সু-খবর।

মামীরা উলুধ্বনি দিলেন। একটু গলা চেপেই যেন দিলেন উলুধ্বনিটা।

একেবারে গা-লাগা পড়শি— সকালে উঠে দু বাড়ির লোক একে অন্যের মুখ দেখে আর-কিছু দেখার আগে। দিনের মধ্যে কাজে-অকাজে শতবার যাওয়া-আসা দু বাড়িতে, আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলের আগে। দু পুরুষের আড়াআড়ি ভুলে থাকে।

আজ মামলা জয়ের খবরে তাই মাত্র তিনবার উলুধ্বনি দিয়েই থেমে গেলেন মামীরা সুন্দর বোঠানকে দেখে। সুন্দর বোঠান সবে হাঁক পেড়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছেন— 'কি সু-খবর গো— ও বড়দিদি?'

মামীমারা ততক্ষণে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। সুন্দর বোঠান বুঝলেন। তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন।

তিন-চার দিন দু বাড়ির লোকই দু বাড়িকে এড়িয়ে চলল, পরে আবার আগের মতো ঠিক হয়ে গেল।

১৮

বর্ষাকালে আর-একটা ব্যাপার—চারি দিকে মাছের কিলিবিলি।

মামারা উঠোনেই বঁড়শি ফেলে কত মাছ ধরেন। বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরতে আমারও খুব ভালো লাগে। মা বকেন। বলেন, 'দিনে দুপুরে যখন-তখন মেয়েমানুষ মাছ ঘাঁটাঘাঁটি করবে— যত সব অলক্ষ্মীর চিহ্ন। পেত্নীতে না ধরে একদিন।'

বিশেষ করে দুপুরবেলা— এই সময়ে একা ঘাটে যাওয়া বারণ আমাদের। আর এই সময়েই গরমের দিনে মা যখন হাতের কাজ নিয়ে মগ্ন— মাকে লুকিয়ে বঁড়শি হাতে নিয়ে বসি গিয়ে আমাদের নিজেদের ঘাটে। দিদিমা আমার সকল কাজের সঙ্গী। শিলে খানিকটা মুড়ি গুঁড়ো করে জল দিয়ে মেখে ময়দার ডেলার মতো করে দেন দিদিমা। তা-ই একটু একটু বঁড়শির মুখে গেঁথে ঘাটের জলে ফেলি। দিদিমা পাড়ে বসে থাকেন।

স্বচ্ছ জল, তলা পর্যন্ত দেখা যায় ঘাটের কাছটায়। এঁটো বাসন ধোওয়া ভাত ডাল পড়ে থাকে জলে, মাছরা খেতে আসে— দেখতে পাই।

বেলে মাছগুলি সবচেয়ে বোকা আর অলস। গা টান করে পড়ে থাকে জলের তলে মাটি ছুঁয়ে। চলাফেরা করে না বেশি। মুখের 'হাঁ'টা বড়ো।

দেখে দেখে বেলে মাছের মুখের কাছে বঁড়শিটা ফেলি, আর ভাবাচিন্তা নেই— হাঁ করে ডেলাটা গিলে ফেলে আর বঁড়শিতে আটকা পড়ে।

বেলে মাছ ধরা সবচেয়ে সোজা। পুঁটি, চেলাও ধরি অনেক। সুতোর মাঝামাঝি এক টুকরো পাটশল্‌মী বাঁধা থাকে— বেশি জলে যখন বঁড়শি ফেলি— পাটশল্‌মীর টুকরোটা নড়লেই বুঝতে পারি বঁড়শির খাবারটা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে মাছ। আর পাটশল্‌মীটুকু ডুবে গেলেই বুঝি বঁড়শি গিলে পালাচ্ছে। তখন হেঁচকা টানে পাড়ে তুলে ফেলি মাছটাকে।

বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা— যেন একটা নেশা।

বর্ষাকালে মাছ ধরতে পারি না। মা থাকেন ঘরের দাওয়ায় বসে। এক-একদিন দুপুরবেলা মা যখন ঘুমিয়ে পড়েন, অন্যরাও ঘুমোন— জেগে আছেন শুধু দিদিমা, আর জেগে আছি আমি— তখন দাওয়ায় বসে দুজনে চেয়ে চেয়ে জল দেখি— কোথায় কিভাবে নড়ছে জল।

নিরামিষ রান্নাঘরের পিছনে উঁচু জায়গাটাতে হাঁটু-জল। দেখি— হাত-দুই পরিমাণ জায়গা নিয়ে খানিকটা জল যেন অন্যভাবে ঝিলমিল করছে— যেন পিলপিল করে কী সব নড়ে বেড়াচ্ছে।

দিদিমাকে দেখাই।

ঘর হতে একটা জোলার গামছা বের করে আনি। দিদিমাকে নিয়ে পা টিপে টিপে জলে নামি। গামছাটাকে দু দিকে দু জনে ধরে পিলপিল করা জায়গাটা গামছাটানা দিয়ে ছেঁকে তুলি। এক রাশি শোল মাছের পোনা উঠল তাতে।

শোল মাছের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলে মা বাবা তাদের আগলে নিয়ে অল্প জলে ঘুরে বেড়ায়। শোল মাছ ধরা তখন খুবই সহজ। লোক দেখলেও দূরে যায় না, বাচ্চাদের আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করে। বঁড়শি ফেললেই ধরা পড়ে।

কত মাছ— শিঙি, মাগুরের তো কথাই নেই। শিঙি মাগুর আমরা মেয়েরাই ধরে ফেলি কত। রাত্রিবেলা শিঙি, মাগুর আসে বেশি ঘাটের কাছে। বর্ষার ঘাট— দূরের পুকুরের ঘাট নয়। রান্নাঘরের 'ওটা'ই তখন ঘাট। 'ওটা' হল সিঁড়ি।

রাত্রে খাবার পরে রান্নাঘরের ওটার উপর বসেই এঁটো বাসন মাজা ধোওয়া হয়। এঁটো ভাত পড়ে জলে। শিঙি, মাগুর খেতে আসে ওটার কাছে।

যতক্ষণ বাসনপত্র ধোওয়া মাজা হতে থাকে ততক্ষণ দিদি আর আমি মাছ ধরা ধরা খেলা খেলি। একজন 'কুপি' ধরি, একজন একটা বড়ো পিতলের গামলায় এক মুঠো ভাত ছড়িয়ে গামলাটা অর্ধেক জলে ডুবিয়ে কানা ধরে বসে থাকি। কুপির আলোয় দেখতে পাই কালো কালো পিছল শিঙি, মাগুর কিলবিল করে এল গামলার ভিতরে। গামলাটা অমনি সোজা করে তুলে ধরি। পাঁচ-সাতটা করে শিঙি ধরা পড়ে প্রতিবারে।

উঠোনের জলে বড়ো মাছ আসে না কখনো— বিশেষ করে রুই, কাতলা। একবার কি করে একটা মাঝারি রকমের রুই এসে পড়ল উঠোনের জলে। পুবের ঘরের সামনে জলে একটা 'ঘাই' পড়তেই চিনিমামা চেঁচিয়ে উঠলেন— 'রুইটা'।

ছোটোমামা ছিলেন দক্ষিণের ঘরে— 'টেটা' হাতে লাফিয়ে পড়লেন জলে। তীরের মতো খাঁজ কাটা এক গোছা লোহার শিক বাঁশের মুখে বাঁধা। একবার বিঁধলে ছাড়াবার উপায় নেই মাছের।

নতুন জল, এখনো জল ঘোলা, মাছটা কোন্‌দিকে গেল দেখা যায় না। ছোটোমামা জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন— জলের স্পন্দন দেখতে দেখতে এক সময় টেটা ছুঁড়ে মারলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। টেটায় বিঁধল রুই মাছটা।

আমরাও সবাই দেখছিলাম। জলের আলোড়ন দেখে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম কোন্‌দিকে পালাল মাছটা। মামীরা তো আফসোসই করছিলেন যে— গেল রুই মাছটা চোখের সামনে থেকে।

মাছ ধরার শখ সব মামার মতো চিনিমামারও। চিনিমামা দূরে যেতেন না, পুবের ঘরের পুব দিকে আমাদের বাড়ির পুকুর। পুকুরের দু পাড়ে বোম্বা হিজল গাছ। চিনিমামা এই গাছে গাছে দড়ি টানা দিয়ে 'জিলা' গাঁথতেন। দিনের বেলা সব তোড়জোড় ঠিক করে সন্ধের একটু আগে 'জিলা' গেঁথে দিতেন।

রাত গভীর না হলে মাছ পড়ে না জিলায়।

জিলা গাঁথা যেদিন হয়, রাত্রে চোখে ঘুম আসে না আমার। কখন জলের উপরে মাছের লেজের ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টির শব্দ উঠবে সেই শুধু ভাবনা। বঁড়শি গাঁথা মাছ ছাড়া পাবার জন্য আছ্‌ড়ে বিছ্‌ড়ে জল ছিটিয়ে তোলপাড় করে জলে।

সজাগ হয়ে শুয়ে থাকি। একটু শব্দ উঠলেই— 'ও চিনিমামা, ও চিনিমামা' বলে চেঁচিয়ে উঠি। চিনিমামা পুবের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। কমিয়ে রাখা লণ্ঠনের পলতে বাড়িয়ে দিয়ে লণ্ঠন হাতে নিয়ে ততক্ষণে তৈরি আমি।

দুজনে নৌকোয় উঠি। মামা বৈঠা বান, আমি লণ্ঠন ধরে বসে থাকি। বুক দুরদুর করে— না-জানি কত বড়ো হবে মাছটা। আওয়াজটা তো ভারীই মনে হয়।

মাছের আকার দেখে কোনোদিন নিরাশ হই, কোনোদিন উল্লাসে উপচে উঠি।

একদিন এই-রকম আওয়াজ শুনে মামা আর আমি গেছি— খুব জোর আওয়াজ উঠেছে এ দিন। নৌকোটা কাছে নিয়ে যাবারও সবুর সইছে না—লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরেছি দেখতে— কত বড়ো মাছটা— মামা আছেন আগ্‌ গলুইতে, দেখেই 'ওরে বাপ্‌রে' বলে সঙ্গে সঙ্গে নৌকো ঘুরিয়ে ফেললেন।

জিলায় গাঁথা পড়েছে মস্ত একটা ঢোঁড়া সাপ।

পরদিন ভোরে ছোটোমামা গিয়ে সাপ গাঁথা বঁড়শিটা দড়ি সমেত কেটে দিলেন। দড়ি বঁড়শি নিয়ে সাপ জলের নীচে ডুব দিল।

আর-একদিন একটা কাছিম গাঁথা পড়ল, বেশ বড়ো কাছিম।

চিনিমামা খুব ধীর শান্ত মানুষ, কখনো জোরে কথা বলেন না। কথা যখন বলেন কান পেতে থাকতে হয়— কি বলছেন শুনবার জন্য। মা এই মামাকে একটু বেশি ভালোবাসেন। তাই চিনিমামার সঙ্গে মাছধরার কাজে যেতে বাধা দেন না আমাকে।

নতুন জল থিতিয়েছে, ময়লা মাটি নীচে পড়ে গেছে। জল এখন স্বচ্ছ, টলটল। তুলসীমণ্ডপ থেকে ঘাট্‌লায় যাবার পথটা নৌকোর মতো— মাঝখানটা ঢালু, গভীর। এই পথটা সবটা জলে ঢাকা। ডুব জল। পথের আমগাছগুলির ডালগুলি জলের উপরে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছড়িয়ে আছে, যেন তারাও সাঁতার কাটছে জলে।

আমরা সঙ্গী সাথি মিলে স্নান করতে নামি এইখানে। একটা আমডাল ধরে জলে ভাসি, ঝাঁপিয়ে গিয়ে আর-একটা আমডাল ধরি। স্নান করাও এক খেলা আমাদের।

শুধু ফুলমামাকে কাছেপিঠে দেখলেই আমাদের যত ভয়। তিনি আমাদের ধরে ধরে দূরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেন। আমরা নাকে মুখে জল খেতে খেতে হাবুডুবু খাই। ফুলমামা হাসেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে থাকি। স্নান আর শেষ হয় না আমাদের। হাতের আঙুল সাদা সিঁটে হয়ে যায়, দু চোখ লাল হয়ে ওঠে— জ্বালা করে। তবু উঠি না জল থেকে।

দিদিমার প্রাণে ভয়— নতুন জল। সর্দি কাশি হবে— জ্বল জ্বালা আছে— জল বেশি পেটে গেলে গোলমাল বাধাবে; তা ছাড়া ঘাসপাতার কাছাকাছি যে জল সে জলে গায়ে চুলকানি হয় বিশ্রী রকমের।

হয়েও ছিল তাই। যখন প্রথম প্রথম আসে জলটা সেই সময়ে সারাদিন কেবল জলে জলে হেঁটেছি। জল চলছে, আমরাও চলছি। পরে দু পায়ে গোড়ালি অবধি বিড়বিড় করে লাল লাল দানা বের হল। বেশ কয়েকদিন ভোগালো।

এই বর্ষার মধ্যেই একদিন মা'র সোনাখুড়ি মারা গেলেন। শ্মশানঘাট জলের তলায়। কোথায় নিয়ে যাবেন দাহ করতে? উঠোনের একধারে যেটুকু জমি জেগেছিল সেখানেই চিতা সাজানো হল। বাড়িরই একটা আমগাছ কাটা হল।

দাউ দাউ করে চিতায় আগুন জ্বলে উঠল। আমরা নিরামিষ ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলাম সব।

আগুনের ও পাশে খুড়ির পুত্র কন্যারা দাঁড়িয়েছিলেন কান্নায় ভরা করুণ মুখ নিয়ে।

দক্ষিণের ঘরে 'মধুখাম'-এর গোড়ায় লম্বা পিলসুজের উপরে তেলের প্রদীপ জ্বলে সন্ধে থেকে। প্রদীপের উপরে ঝোলে মাটির একটি বড়ো সরা। প্রদীপ-শিখার যত কালি সরায় লেগে আটকে থাকে। ঘরে বা চালে ছড়ায় না কালি। এই কালি দিয়ে দিদিমা আমাদের কাজল-লতায় কাজল বানিয়ে দেন।

পিতলের প্রদীপভরা তেল, দুটি সলতে পুড়তে থাকে মুখে, দুটি থাকে আড়াআড়ি করা বুকে। মুখের পলতে পুড়ে গেলে তখন এই পলতে দুটি কাঠি দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয় সেখানে।

তেল ফুরিয়ে এলে সলতে পুড়তে পুড়তে আগুনটা প্রদীপের মাঝখানটায় চলে আসে— সেটা দোষের। তাই তেল থাকতে থাকতেই আরো তেল ঢেলে দেন প্রদীপে দিদিমা। বলেন— 'প্রদীপের বুক জ্বলতে দিতে নেই, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়'।

গৃহলক্ষ্মীর কাজ সব দিকে লক্ষ রাখা, সবাইকে ঠাণ্ডা রাখা। দিদিমা বলেন— 'মশলা বেটে শিলনোড়া ফেলে রাখতে নেই। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে শীতল করে শিলনোড়া দাঁড় করিয়ে রাখো। পিষণের জ্বালা— বড়ো জ্বালা। কাউকে জ্বলতে দিতে নেই। পাথর, পাত্র— সবই এই বুকের সমান। সবাইকে ঠাণ্ডা রাখো'।

সন্ধে হতে প্রদীপ ঘিরে বসি আমরা। মা পুরাণ পড়েন। মামীরা কেউ চিঠি লেখেন, কেউ লেস বোনেন। দিদিমা আমাদের নিয়ে 'পরস্তাব' বলেন— এক যে ছিল 'ডালোমকুমার'—। এই ডালিমকুমারের গল্প রোজ শুনি— রোজই অদ্ভুত লাগে।

খাওয়ার পাট সারতে হয়। ছোট্ট কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে মামীরা রান্নাঘরে যান, পিঁড়ি পেতে খাবার ঠাঁই করেন। বেড়ার ধারে ধারে ব্যাঙ ডাকে মোটা গলায়— মিহি গলায়।

খাওয়ার পর পুরুষদের, ছোটোদের, মুখ ধুতে জল গড়িয়ে দেন মামীরা কাঁসার বড়ো বড়ো ঘটিতে করে। আমরা চলে আসি। মামীরা খেয়ে বাসন মেজে হাত পা ধুয়ে অনেক পরে আসেন ঘরে।

এই কুপির আলোতেই হয় সব। আলোর অভাব লাগে না কখনো।

গাছভরা জোনাকি, আকাশভরা তারা— কত আলো কাছে দূরে। আর কত চাই?

১৯

একদিন জলে টান ধরল। সকালবেলা দেখা গেল চার আঙুল জল নেমে গেছে; দাওয়ার গায়ে দাগ রেখে গেছে।

সবাই নড়েচড়ে উঠলেন। মা মামীরা হাতের কাজ তুলে রাখলেন।

এবারে রোজ জল কমতে থাকবে। জল নামার সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়বে।

চার দিকে থক্‌থকে কাদা, ঘাসপাতার পচা গন্ধ, রোদের তাতে তেতে ওঠা ভাপ, সাপ ব্যাঙ মশা— হরেক রকমের উপদ্রব। তার উপরে আছে অসুখ-বিসুখ নানা প্রকারের। জল টানার সময়েই যত কষ্ট সবদিকে।

যে পথ দিয়ে এসেছিল জল— সে পথেই নেমে চলেছে। হু হু করে চলেছে।

এক, দুই তিন, চার— চারদিনের দিনই উঠোন থেকে সব জল নেমে গেল নীচে।

একদিন ঘাট্‌লায় দাঁড়িয়ে পুণ্য ঘোষ চিৎকার করতে লাগলেন। শুনতে পেয়ে মামারা ছুটলেন।

'সিদ্ধেশ্বরীতলা'র দিকে মাইল মাইল জুড়ে ধানক্ষেত। বর্ষায় জল যত বাড়ে, ধানগাছও লম্বা হয় তত। সারা অঙ্গ জলে ডুবিয়ে মাথাটা শুধু তুলে রাখে উপরে। তাই এখানকার ধানগাছে খড় হয় না ভালো। জলে ভেজা গাছটা শুকোলে হয় 'নাড়া'। রস জ্বাল দেবার কাজে লাগে তা। ঘর ছায় লোকে 'ছন্' দিয়ে।

বর্ষার জলে ক্ষেতের মাটি হয়ে যায় নরম কাদা। কাদায় ধানের গোড়া থাকে আলগা হয়ে।

পুণ্য ঘোষ কি কাজে এসেছেন ঘাট্‌লায়, ঘাট্‌লায় এলে চোখ আপনা থেকে যায় সিদ্ধেশ্বরীতলায়। পুণ্য ঘোষ দেখেন দূরে একটা ধানক্ষেত যেন নড়ছে— যেন চলছে।

পুণ্য ঘোষের চিৎকার যাঁরা যাঁরা শুনলেন সবাই ছুটে এলেন। কী ব্যাপার? না, জল নেমে যাবার মুখে গোড়া আলগা ধানক্ষেতও তুলে নিয়ে চলেছে সঙ্গে। হাওয়াও দিচ্ছে আজ। ধানক্ষেত চলতে শুরু করলে একটার পর আর-একটাও চলবে। কার জমির ধান কার ক্ষেতে গিয়ে ঠেকবে শেষে।

কার ক্ষেত কে জানে, দেখবার সময় নেই। তাদের ডাকবারও সময় নেই।

ঝট্‌পট্ বাঁশ কেটে নৌকোয় বাঁশ দড়ির বোঝা নিয়ে ছুটলেন ছোটোমামা দুদুমামা, আরো কয়েকজন। খুঁটি পুঁতে লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়ে বেড়া বেঁধে আটকে দিলেন ক্ষেতের চলা।

ক্ষেতের ধান ক্ষেতে রয়ে গেল— জল নেমে গেল।

এর পর রোজ যখন রোদ উঠবে, ধানগাছও একটু একটু করে সোজা হবে, শেষে একদিন শক্ত মাটি পেয়ে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। সবুজের উপরে শরতের সোনালি আলো এসে পড়বে— আলো হাসবে, ধানের শিষ হাসবে, হাওয়া হেসে লুটোপুটি খাবে তাদের উপরে।

মা'র কাছে গ্রামের ভদ্রলোক, ভুঁইমালী নমশূদ্র চাঁড়াল সব রকমের লোক এসে ভিড় করে সকালে— ওষুধ নিতে। মা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেন সবাইকে। দিনের একটা বড়ো কাজ মা'র— অনেকক্ষণের কাজ।

একবার মা তখন শ্বশুরালয়ে— এ আমার জন্মের আগের ঘটনা। গ্রামে কলেরা ঢুকল।

আমার এক দাদা এক দিদি— দশ আর বারো বছরের চঞ্চু, ভীমা— দুই ভাইবোনের একসঙ্গে কলেরা হল। একই চিতায় দুই জনকে শোওয়ানো হল।

বাবা ছিলেন সদরে। খবর পেয়ে এলেন যখন, ভূলুণ্ঠিতা মা শুধু একটি আক্ষেপই করে যাচ্ছেন যে— এক ফোঁটা ওষুধ তিনি দিতে পারলেন না সন্তানদের মুখে।

সন্তানহারা জননীর এ বেদনা বাবাকে চিন্তিত বিচলিত করল। মাকে দিয়ে তিনি দেখলেন গ্রামের ঘরে ঘরে এমনিতরো অসহায় সকল জননীদের।

পাঁচ-ছয় গ্রাম দূরে দূরে ডাক্তার, বৈদ্য। তাদের ডেকে আনতে আনতে রোগী শেষ হয়ে যায় ততক্ষণে।

বাবা কলকাতায় গিয়ে হোমিওপ্যাথি পড়লেন, শিখলেন, জানলেন।

গ্রামের মেয়েরা বেশির ভাগই নিরক্ষরা, অথচ তারা সকলেই শ্রুতিধরী। কত শত কথা কাহিনী গান চলে আসছে তাদের মুখে মুখে— ছড়ার ছন্দে।

বাবা ছড়ায় গেঁথে দিলেন রোগ, রোগের নির্ণয়, রোগের ওষুধ, পরিমাণ, পথ্য— সব। 'হোমিও গাথা' নামে বই বের হল তাঁর।

'হোমিও গাথা'র ছড়া গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চালু হয়ে গেল, চালু হল সকল মায়ের মুখে মুখে। রোগকাতর সন্তানের মুখে জননী এখন নিজের হাতে ওষুধ ঢেলে দেন। জননীরা আর অসহায় নন।

মা খুব ভালো হোমিওপ্যাথি জানেন। মা'র সঙ্গে সর্বদা একটা বড়ো বাক্স থাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধের। এই বাক্সটি ছাড়া মা যান না কোথাও।

বর্ষার জল চলে যায়। কাদামাটি শুকিয়ে ওঠে। ভিতের ধারে ধারে ক্ষয়ে-যাওয়া ধসে-যাওয়া মাটি আবার তুলে দেওয়া হয়। পরিমাটি দিয়ে 'পিড়া' লেপা হয়, মেঝে লেপা হয়।

চার দিকে সাজ-সাজ রব।

তলা বিছিয়ে শিউলিফুল ঝরে থাকে। ভোরে উঠে সাজি ভরে ফুল কুড়োই। পুবের বাড়িতে এক জোড়া গাছে সব চেয়ে বেশি ফোটে শিউলি। সেখানেই আগে যাই। গাছের ডাল ধরে ঝাঁকুনি দিই, ঝুরঝুর করে আরো আরো ফুল পড়ে তলায়। আরো সাজি ভরি ফুলে ফুলে।

কিছু ফুল ঠাকুরঘরে রাখি। বাকিটা উঠোনে বসে বসে পাপ্‌ড়ি বোঁটা আলাদা করি। শিউলি ফুলের বোঁটাগুলি রোদে শুকিয়ে কৌটোয় ভরে রাখি— শ্রীপঞ্চমীর দিন হলুদ রঙের শাড়ি পরব— এই বোঁটার রঙে রাঙিয়ে। আর, ফুলের পাপড়িগুলির রস লোহার বাটিতে করে রোদে দিই— সর শুকিয়ে ঘন হয়ে কালো কুচকুচে

গোলা হয়। শিশিতে ভরে রাখি— কপালে কালো টিপ পরি। হাল্কা একটা সুগন্ধ থাকে এ টিপে।

দেখতে দেখতে পুজো এসে পড়ে। মামারা যাঁরা বিদেশে আছেন চলে আসেন দেশে। আজ একজন এসে পৌঁছলেন, কাল একজন। প্রতি বাড়িতে নিত্য নতুন আগমনের আহ্লাদ। আমাদের বাড়িতে মামা-মামী এলেন তো সরকার বাড়ির ওরা এল ছুটে। আবার ঘোষের বাড়িতে মেয়ে এল শ্বশুরবাড়ি থেকে তো আমরা ছুটলাম দেখতে।

কেউ আসছে শোনামাত্র ভিড় হয় সেই বাড়িতে।

এই 'আসা'-টাই দেখতে আনন্দ।

ডুলি থেকে নামল— কি নৌকো ঘাটে লাগল— কি হাঁটাপথে এল— দেশে এসেছে এই ভাবটা— যে এল তাকেও এই সময়টুকু আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলছে।

দিন দিন নতুন আনন্দ। মামারা এসেছেন— কত রকমের নতুন জিনিস এনেছেন কলকাতা থেকে। এনেছেন পুজোয় পরবার নতুন কাপড় 'গাট্ঠি' বাঁধা।

গাঁট্রি খোলা হবে, ঘিরে বসে থাকি দেখতে— কী শাড়ি এনেছেন পুজোয় এবারে। নতুন শাড়ির সৌরভই আলাদা— যেন 'পুজো পুজো' গন্ধ মাখা।

ঘরে ঘরে দরজার মাথায় শোলার জোড়া কদমফুল টানিয়ে দিয়ে গেল মালী। সাদা শোলার ফুল দুটিতে যেন সকল শুভ্রতা ঢেলে দিল এনে।

নন্দীদের দুর্গামণ্ডপে প্রতিমা গড়া হচ্ছে— কুমোর এসেছে ভিন গাঁ থেকে। খড় বাঁধা হল, খড়ের উপর মাটি দেওয়া হল। এবারে রঙ হচ্ছে, সাজ হচ্ছে— ছুটে ছুটে গিয়ে দেখি।

ষষ্ঠীর আগের দিন রাত্রে গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে প্রতিমার 'চক্ষুদান' হবে। এইটিই শেষ কাজ প্রতিমা গড়ার। চক্ষুদান হয়ে গেলে আর কুমোর হাত চালাবে না প্রতিমায়।

দাঁড়িয়ে আছি দিদিমাকে ধরে। কুমোর কালো রঙে তুলি মাখিয়ে ভুরু টানলো, চোখের রেখা টানলো, পরে চোখের ভিতরে কালো মণিটি বসিয়ে দিল। দেবী জ্বলজ্বল করে দুচোখ মেলে চাইলেন।

মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে উঠলেন।

রাত না পোহাতে ঢাকের বাদ্যি বেজে ওঠে। এ বাজনা আলাদা। পুজো পুজো রব এতে। প্রাণ নেচে ওঠে।

পুজো দেখে প্রসাদ খেয়ে নতুন শাড়ির খস্‌খসানি সামলে পুজোর কয়টা দিন কোথা দিয়ে কাটে খেয়াল থাকে না। ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী পার হয়ে যায়। দশমী আসে।

এই দিন সকাল থেকে যেন মন কেমন করে। চার দিকে যেন একটা বিষাদের সুর। চলাফেলা ধীর হয়ে আসে।

বিকেল বেলা ঢাক ঢোল বাজিয়ে ধূপের ধোঁয়ায় অসুর সিংহ কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতীকে ঢেকে নিয়ে প্রতিমার মাচা ঘাড়ে তুলে নেয় গ্রামের জোয়ান ছেলেরা। চালচিত্রের মাঝখানে সবার উপরে দেবীর মুখখানি চিক্‌চিক্‌ করতে থাকে।

হৈ হৈ করে মাঝ-পুকুরে নেমে প্রতিমা ডুবিয়ে সাঁতার কেটে পারে উঠে আসে ছেলের দল।

আমরা বাড়ি ফিরি।

সন্ধে হয়ে গেছে।

দিদিমা রেকাবিতে ধানদূর্বা সাজিয়ে রেখেছেন। বিসর্জনের পর বিজয়া। গুরুজনদের প্রণাম করি, তাঁরা আমাদের মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন, মিষ্টি খেতে দেন।

পুরুষেরা প্রণামের পরে ছোটো বড়ো সবাই সবাইকে বুকে জড়িয়ে 'কোলাকুলি' করেন।

বিজয়াতে প্রণাম করার আর মিষ্টি খাওয়ার বিশেষ নিয়ম।

নিজের বাড়ির লোকদের প্রণাম করা হয়ে গেলে অন্য বাড়ি যাই। একদিনে হয় না সবাইকে প্রণাম সারা। একদিন কেন— পর পর কয়টা দিনই ঘুরি বাড়ি বাড়ি। আর-সকলেও তাই করে। কয়দিন এবেলা ওবেলা এত মিষ্টি খেতে হয় যে, ভাতের জায়গা থাকে না আর।

এই আয়োজন সকল বাড়িতেই।

এইভাবে মিষ্টি খেতে হয় লক্ষ্মী পুজোতেও। তখন বরং আরো বেশি। লক্ষ্মী পুজো হয়ে গেলে পরে ছেলেমেয়েরা এবাড়ি ওবাড়ি যাবেই নাড়ু মোয়া মুড়কি তক্‌তি খেতে। না-যাওয়াটা অপরাধ। এ নিমন্ত্রণ ধরাবাঁধা। কাউকে বলতে হয় না নতুন করে।

বিজয়াতে মালপোয়া রসবড়া গঙ্গাজলি ক্ষীর সন্দেশ— নানা মিষ্টি চলে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার মিষ্টি আলাদা। নাড়ু আর মোয়াই প্রধান। হরেক রকমের নাড়ু—

নারকেলের নাড়ু তিলের নাড়ু, খই-এর ছাতুর নাড়ু— নাড়ুর মধ্যেও নানার রকমারি— কোনোটা বা ভেজে তৈরি। মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের মোয়া, খই-এর উখ্‌রা— এর মধ্যেও আবার বাড়ি-বাড়ির বৈশিষ্ট্য আলাদা। পুবের বাড়ির ধনখুড়ির হাতের কর্পূর দেওয়া খই-এর ছাতুর নাড়ুর তুলনা হয় না। চিনিমামীর হাতের ভাজা জিরের গুঁড়ো মিলিয়ে মুড়ির মোয়া— অপূর্ব।

বড়োমামীমার হাতের পাক খুব ভালো। মুড়ির মোয়াগুলি ঠন্‌ঠন্‌ করে। নাড়ু মোয়ায় শক্ত পাক না হলে খেতে ভালো লাগে না।

দুর্গাপূজা— আড়ম্বরের পূজা— সবাই করতে পারে না। কিন্তু লক্ষ্মীপূজার উৎসব সকল বাড়িতে।

দুর্গাপূজার আগে— যখন ঘর-বারান্দার ঝুল ঝেড়ে, কাঁথা কাপড় সোডা সাবানে ধুয়ে, পুরোনো হাঁড়ি পাতিল 'ছিটালে' ফেলে, পিড়া পৈঠা গোবর-মাটিতে লেপে সব-কিছু নতুন করা হয়— সে সময়ে 'মধুখামে'র গায়ে আঁকা এক বছরের পুরাতন লক্ষ্মীঠাকরুনকেও ধুয়ে ঘষে তুলে ফেলেন মামীরা।

প্রতি বছর কোজাগরী পূর্ণিমার আগে আবার নতুন করে লক্ষ্মী আঁকা হয় 'মধুখামে'।

আঁকতে অনেকেই জানেন গ্রামে, তবু তার মধ্যে যাঁর হাতযশ বেশি আঁকায়, তাঁরই দর বাড়ে এই সময়ে। কাড়াকাড়ি পড়ে যায় তাঁকে নিয়ে।

সবাই চায়— যেন তাঁদের মধুখামই বেশি সুন্দর হয়— আর-সকলের চেয়ে।

ওস্তাদ আঁকিয়ে হলেন নয়াবাড়ির সুখদাঠাক্‌রুন আর চৌধুরীবাড়ির ছোট্‌ঠাইন। মামীরা ছোট্‌ঠাইনকে ধরলেন লক্ষ্মী এঁকে দেবার জন্য।

ছোট্‌ঠাইন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আসেন। —অন্য বাড়ির বউ গিন্নিরাও আসেন আঁকা দেখতে। আগে পানের 'ডাবর' খুলে পান দোক্তা খাওয়া হয়, কিছু হাসি গল্প হয়, তার পর আঁকার কাজে হাত লাগান।

নারকেলের আঁচিতে ভাগে ভাগে রঙ গোলা— কোনোটাতে পিউড়ি কোনোটাতে এলামাটি, গেরিমাটি, সিঁদুর, মেটে-সিঁদুর, নীল ভুসোকালি আর খড়িমাটি। ছোট্‌ ঠাইন নিজেই তুলি বানিয়ে নেন কয়েকটা বাঁশের কাঠির ডগায় পাটের টুকরো বেঁধে। তুলি বানিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় জল নিয়ে তুলি জলে ডুবিয়ে টিপে টিপে তুলির মুখ সরু করেন সূক্ষ্ম কাজের জন্য।

মধুখামের যেখানে লক্ষ্মীঠাকরুন আঁকা হবে সেইখানটায় বেলের আঠা মেশানো খড়িমাটি গোলার প্রলেপ দিয়ে আঁকার উপযুক্ত জমি আগেই করে রেখেছেন মামীরা।

ছোট্‌ঠাইন তুলি হাতে নিয়ে আঁকতে শুরু করেন।

ছোট্‌ঠাইনকে পেন্সিল ধরতে দেখি নি কখনো।

লাল রঙে তুলি ডুবিয়ে শাড়ি— শাড়ির আঁচল এঁকে ফেললেন। পিউড়ি দিয়ে লক্ষ্মীঠাকরুনের অঙ্গ হল। ভুসোকালিতে এলানো চুল— রঙে রঙে নীল সরোবর, গোলাপি পদ্ম, সবুজ পাতা, সাদা পেঁচা— ঝাঁপি, কড়ি সব-কিছু হয়ে গেল। ছবিতে 'একমেটে' কাজ হল।

এর পর ধীরে ধীরে শাড়িতে বুটি ফুটল, অঙ্গে অলংকার উঠল, চুলে ঢেউ খেলল, পেঁচার পালক গজাল— একমেটে দুমেটে তিনমেটে কাজের বেলায় যেখানে যা-কিছু আছে ছবিতে— সবার রূপ খুলে গেল। পূর্ণ লক্ষ্মীমূর্তি প্রকাশ পেল।

ধীরে ধীরেই হল এ কাজ। পর পর কয়েক দিনই লাগল আঁকা সম্পূর্ণ করতে। গুণী মানুষ ছোট্‌ঠাইন। বিয়ের পিঁড়ি আঁকা এঁকে ছাড়া হয় না। জোড়ামাছ, জোড়াময়ূর, জোড়াপ্রজাপতি— ছোট্‌ঠাইনের মতো আর-কেউ পারে না আঁকতে।

বিয়ের পিঁড়িতে সব-কিছুর জোড়া জোড়ার নক্‌শা থাকা চাই। জোড়া হল শুভ চিহ্ন— মিলন চিহ্ন।

দক্ষিণের ঘরে যখন মধুখামে লক্ষ্মী আঁকার কাজ চলে, দিদিমা মামীরা তখন একদল বসে যান নিরামিষ ঘরে— লক্ষ্মীপূজার নাড়ু মোয়া করতে। এ কাজও চলে দিনকয়েক ধরে। এই নাড়ু মোয়া গড়াও একটা পর্ব। ধামাভর্তি টিনভর্তি নাড়ু মোয়া হয়। ধোপা নাপিত বৈরাগী মালী, অতিথি অভ্যাগত, পাড়া প্রতিবেশী— আসে জন বসে জন সবাইকে দিতে হয় ডালা সাজিয়ে, থালা সাজিয়ে। চলবে কালীপূজা অবধি এই নাড়ু মোয়া খাওয়ার উৎসব।

লক্ষ্মীপূজার দিন, আলপনার দিন। লক্ষ্মীঠাকুরানী আসেন আলপনা মাড়িয়ে, বসেন আলপনার উপরে। আলপনাই লক্ষ্মীপূজার প্রধান অঙ্গ। এই দিন আঙিনা জুড়ে আলপনা দেওয়া হয়।

আলপনায় মা'র শখ। মার নিপুণ হাত। কয়দিন আগে হতেই রোজ পলি মাটি দিয়ে উঠোন লেপিয়ে মসৃণ করে রাখা হয়েছে জমি। মা উঠোনের ঠিক মধ্যিখানে একটা কাঠি পুঁতে তাতে সুতলি বেঁধে তার সঙ্গে আর-একটা কাঠি গেঁথে ঘুরে ঘুরে গোল দাগ কাটেন মাটিতে। ছোটো থেকে বড়ো, আরো বড়ো আরো আরো— উঠোন অনুযায়ী যতখানি সম্ভব— সর্বশেষ গোলটা তত বড়ো হয়।

এই গোলদাগের নিশানটুকুই যা দেগে নেন আলপনায়, তার পর সবটা হয় হাতের আঙুলের নিপুণতায়।

কাঁসার জাম-বাটি ভরা ভরা আতপ চালের পিটুলি গোলা হাতে মা বসে যান মামীদের নিয়ে আলপনা দিতে।

সব চেয়ে ভিতরের গোলটাতে হয় পদ্মের নক্‌শা। এক-একবার এক-এক রকমের।

বাঁকা পদ্মের হাত দিদিমার সবচেয়ে ভালো। আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এমনভাবে বাঁকা-পদ্মের পাপড়ির রেখা টানেন— শেষের রেখাটি গিয়ে যখন শুরুতে মেলে— মাপে মাপে একেবারে ঠিকটি হয়ে মেলে। গোটা পদ্মের কোথাও একটু অসমান বা চাপাচুপি হয় না।

অষ্টদল, শতদল, সহস্রদল— এই পদ্মগুলি মা'র হাতে খোলে বেশি। সহস্র-দলের পাপড়িগুলি ছোটো হতে হতে ক্রমশ ছোটো হচ্ছে তো হচ্ছেই। দেখে মনে হয় যেন শেষ নেই এর।

তার পর পদ্ম ঘিরে চলে লতা। কত রকমের লতা— শঙ্খলতা চালতেলতা কলমীলতা খুন্তিলতা চিরুনিলতা কলালতা অনন্তনাগ— নাগ জড়িয়ে পেঁচিয়ে চলেইছে আলপনা ঘিরে, শেষে গিয়ে মিলেছে নিজের মুখে লেজে এক হয়ে।

আলপনা বাড়তে বাড়তে যখন শেষ সীমানায় আসে তখন তা ঘিরে পড়ে এক সারি 'যাত্রাকলস'। যাত্রাকলস দিয়ে আলপনা শেষ হয়।

সকাল থেকে বসেন মায়েরা আলপনার তোড়জোড় নিয়ে। এ আলপনার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পাই নে আমরা। দিদিমা আমাদের হাতে ছোটো ছোটো বাটিতে পিটুলি গোলা দিয়ে বলেন, "আজ কেবল 'লক্ষ্মীর পাড়া' দিতে হয়, তোরা 'লক্ষ্মীর পাড়া' দে।"

'লক্ষ্মীর পাড়া' হল লক্ষ্মীর জোড়া পায়ের ছাপ।

আমরা বাড়ির দাওয়ায় পৈঠায় ধানের গোলায়, গোয়াল ঘরে, চালের মট্‌কিতে, সিঁড়ির ধাপে, রান্নাঘরে, পথে— সর্বত্রই এই 'পাড়া' এঁকে ঘুরি। মায়েদের চেয়ে কম ব্যস্ত থাকি না আমরাও। একবার করে 'পাড়া' আঁকি, আর উঠোনের ধারে দাঁড়িয়ে মায়েদের আলপনা দেওয়া দেখি।

ওঁরা আলপনা দেন— একদিক দিয়ে কাঁচা গোলার আলপনা দেওয়া হয়, আর-দিক দিয়ে গোলা শুকিয়ে সাদা আলপনা আরো সাদা ফুটফুটে হয়ে ওঠে।

গামলা গামলা গোলা লাগে এদিন এই আলপনায়।

আলপনার মাঝে মাঝে রঙের কাজও আসে কিছু কিছু। সিঁদুর দিয়ে লাল, হলুদ দিয়ে হলদে আর সিমপাতার রস দিয়ে হয় সবুজ রঙের কাজ। সাদা আলপনার মাঝে মাঝে অল্পসল্প এই রঙগুলি যেন রঙিন পাথরের টুকরো হয়ে ফুটে ওঠে নক্‌শার ভিতরে।

বড়ো আলপনা শেষ হলে পড়ে 'ধানছড়া'। ধানছড়ার দু পাশে পড়ে লক্ষ্মীর পা। এই পা পাশাপাশি জোড়া পা নয়। একটি একটি পা— একটি এ পাশে, একটি ধানছড়ার ও পাশে। লক্ষ্মী— সবেতেই লক্ষ্মী, চলনেও লক্ষ্মী; এক এক করে পা ফেলে ফেলে আসেন। আসেন 'ধানছড়া' দিয়ে। ধান— লক্ষ্মী। ধান-ছাড়া ফেলেন না পা। এই ধানছড়ার উপর দিয়ে পা ফেলে লক্ষ্মী আসবেন উঠোনে, যাবেন ঘরে— যাবেন গৃহস্থের গোলায়, গোয়ালে, ঢেঁকিশালে— ঘরে ঘরে দোরে দোরে। সর্বত্র তাঁর যাবার জন্য ধানছড়া পড়ে।

পাড়ার মেয়েরা গিন্নিরা এ ওঁর বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেন, কার বাড়ির আলপনা কত বড়ো হচ্ছে— কার বাড়ির আলপনা বেশি সুন্দর। তাঁরা আলপনা দেখেন আর বলাবলি করেন— 'সিঙ্গী বাড়ির কলমীলতায় আরো সুন্দর সবুজ রঙ খেলিয়েছে মেজোবউ। নয়াবাড়ির শঙ্খলতা হয়েছে অতি মিহিটানের'। আবার এ বাড়ির যাত্রাকলসের বাহারের কথা পৌঁছে যায় সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাড়িতে। বড়োমামীমা এক ফাঁকে দেখে এলেন সিঙ্গী বাড়ির আলপনা। লক্ষ্মীপুজোর আলপনা নিয়ে সকল বাড়ির মেয়েদের মনেই একটা চাপা উত্তেজনা থাকে— কার বাড়ির আলপনার কতখানি 'ডাক' উঠল। আলপনায় 'ডাক' ওঠা চাই। 'ঝগড়ায় খোঁটা, আলপনায় ফোঁটা'— এ নইলে জমে না কোনোটা। মা চালতেলতার ফাঁকে ফাঁকে ফোঁটা দিয়ে দেন। লতা আরো জমে ওঠে— লতা ডেকে ওঠে।

আলপনা সারা হতে হতে বিকেল গড়িয়ে যায়। সবাই হাত-পা ধুয়ে এবারে দক্ষিণের ঘরে ঢোকেন। এই ঘরেই মধুখাম।

মধুখামের গোড়া ঘিরেও আজ আলপনা দেওয়া হয়। লক্ষ্মীপুজো হবে এইখানেই। বাজার হতে আজ এসেছে 'লক্ষ্মীসরা'; —সবার উপর লক্ষ্মীমূর্তি আঁকা। এই লক্ষ্মীসরার সামনে পুজোর সামগ্রী সাজানো হয়। দু পাশে থাকে ধামাভরা উখ্‌রা মোয়া, ডালায় ডালায় নাড়ু, থালায় থালায় ক্ষীর— বারকোশ ভরা নারকেল কোরার স্তূপ।

লক্ষ্মীপুজোয় নারকেলের ছড়াছড়ি। নারকেল কোরা, নারকেল তক্‌তি, নারকেল নাড়ু— নারকেলের চিঁড়া জিরা লিচু গঙ্গাজলি— হরেক রকমের জিনিস।

নারকেলের চিঁড়া, জিরা কাটেন মা নিজের হাতে। ঠিক যেন সরু সরু জিরা, পাতলা পাতলা চিঁড়া। কলাপাতার 'মাইজে' যখন নৈবেদ্যর মতো চুড়ো করে সাজিয়ে দেন দু পাশে এগুলি— চিকন সবুজ পাতার উপরে দুধ-ধব্‌ধবে নারকেলের চিঁড়া জিরাগুলি যেন একটা স্বর্গীয় সুষমা ঢালে এনে ঘরে।

নারকেলের এত সব দিয়েও আর-একটা বিশেষ জিনিস চাই এইদিন— নারকেলের ফোঁপড়া।

নারকেল জলের গ্লাসের উপরে ছোট্ট একটি রেকাবিতে থাকে এই ফোঁপড়া— এটা লক্ষ্মীর 'জলপান'।

এইসঙ্গে তালের ফোঁপড়াও থাকে। যত তাল খাওয়া হয়েছে এই বছরে বড়া পিঠে ক'রে, সব আঁঠিগুলি জমা থাকে উঠোনের ধারে। সবগুলিতে ফোঁপড়া হয়ে যায় এতদিনে।

তালের আঁঠি— শক্ত আঁঠি। ছোটোমামা একটা খণ্ড কাঠের উপরে তাল আঁঠি রেখে হাত-দা দিয়ে কুপিয়ে দু-আধখানা করে দেন। মামীরা ফোঁপড়া বের করে নেন।

লক্ষ্মীপুজোয় আরো একটা জিনিস বিশেষভাবে লাগে— একটি ছোট্ট নৌকো। এই নৌকোটি হয় কলাগাছের খোল দিয়ে। বৈঠা, পাটাতন, ছই, সব হয় হুবহু আসল নৌকোর মতো। নৌকোর সামনে থাকে ঐ খোল দিয়েই বানানো পাঁচটা ডোল। এই পাঁচ ডোলে থাকে হলুদ, যব, কাঁচামুগ, তিল, ধান— পঞ্চশস্য। এটি মা-লক্ষ্মীর নৌকো।

এই নৌকো বানিয়ে দেন অন্য মামারা—ছোটোমামা নয়।

সাদা রঙের কলাগাছের খোলের তৈরি। এই ছোট্ট নৌকোটি যেন সাদা মেঘের ঢেউ বেয়ে এসে লাগে ঘরে। উঁকি-ঝুঁকি দিই, মনে হয় এই ছই-এর ভিতর কোথায় যেন লক্ষ্মীঠাকরুন লুকিয়ে বসে।

সন্ধেবেলা পুরুতমশাই আসেন, পুজো করেন। এই একটি দিন সারা গ্রাম একসঙ্গে কলকলিয়ে ওঠে। উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঘণ্টা কাঁসর ঘরে ঘরে একই সঙ্গে বেজে ওঠে। লক্ষ্মীঠাকরুনের আগমনবার্তা দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কোজাগরী পূর্ণিমা— নামী পূর্ণিমা। ফুটফুটে আলো। আজ আর রাতের আড়াল নেই কোথাও। গাছের তলা, বিলের ধান, দূরের পথ— সব আজ কাছে এসে যায়। স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

এতক্ষণে মা বের হন মামীদের নিয়ে পাড়া ঘুরে দেখতে।

পূর্ণিমার আলোয় শ্বেত-শুভ্র আলপনাগুলি উছ্‌লে ওঠে। যেন রাশি রাশি শ্বেতকমলের ছড়াছড়ি। কোজাগরীর যত আলো যেন আজ বাঁধা পড়েছে সকলের আঙিনায়।

গ্রামের সকল ধূলিমাটি আজ শুচিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

গ্রাম হাসে। গ্রামের বাড়িগুলি হাসে। বাড়ির বউ-গিন্নিরা হাসে আপন তৃপ্তিতে।

শুক্লপক্ষ পার হয়। কৃষ্ণপক্ষ আসে। এই অমাবস্যায় কালীপূজা। কালীপূজা মামাদের শরিকের পূজা। এ বছর পূজা পড়েছে মামাদের ভাগে।

গ্রামে মূর্তি গড়ে কালীপূজা হয় এক শুধু বোসেদের বাড়িতেই।

মাঝরাত্রিতে পূজো। —'বলি' অবধি থাকতে পারি না জেগে। ঢাক-ঢোলের বাদ্যির মধ্যে উঠোনে-পাতা শতরঞ্চির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। দিদিমাও আজ খেয়াল রাখেন না আমাদের।

দীপান্বিতায় প্রদীপ জ্বালাবার ধুম। আগের দিন পুকুরের নরম মাটি দিয়ে দিদিমা আমাদের নিয়ে প্রদীপ গড়তে বসেন। হাতের তেলোয় মাটির নাড়ু করে দু আঙুলে টিপে টিপে বাটির মতো গড়ি, একদিকটা একটু চেপে দিই— প্রদীপ হয়ে যায়।

এইরকম ছোটো ছোটো প্রদীপ বানিয়ে কুলোয় করে রোদে দিই। কয়েক শো প্রদীপই বানিয়ে ফেলি।

দীপান্বিতার দিন বিকেলবেলা প্রদীপগুলিতে তেল সলতে দিয়ে ঠিক করে রাখি, সন্ধেবেলা জ্বেলে দিই।

প্রথম প্রদীপটা দিই তুলসীতলায়— প্রণাম করি। ঠাকুরঘরে দিই একটি— প্রণাম করি। মধুখামের কাছে দিই— প্রণাম করি।

এবার প্রদীপে প্রদীপে সারা বাড়ি সাজাই।

মামারা মামীরাও হাত দেন এ কাজে। দিদিমা বলেন, 'সব জায়গায় আলো দে। আজ 'আন্ধার' রাখে না কিছু'।

ঘাটের পথে ঘরের ছাইচে উঠোনের আমগাছের গোড়ায়— সকলখানেই একটি করে প্রদীপ ধরে দিই।

কালীপুজোয় বাজি পোড়াবার নিয়ম। মামারা কলকাতা থেকে এবারে নতুন বাজি এনেছেন— বাজির নাম 'ইলেকট্রিক লাইট'। সরু ছোট্ট একটা সাদা তার, তারটা যতটুকু সময় জ্বলে নীলচে একটা আলোর আভায় ভরে যায় জায়গাটা।

এই তারটা জ্বললেই সবাই সবার মুখের দিকে তাকাই— দেখি, আলোতে কার মুখ কতটা ফর্সা লাগে।

আর এনেছেন মামারা 'চট্‌পটি বাজি'। মেঝেতে ঘষলে চট্‌পট-পট্‌পট শব্দ হয়। এ ছাড়া তারাবাজি, মরচে বাজি, পট্‌কা, ফুলঝুরি, এ-সব তো আছেই। মেজোমামা খুব ভালো তুবড়ি তৈরি করতে পারেন। বাজি তৈরির শখ তাঁর। একবার তুবড়ি বানাতে গিয়ে কি করে যেন কি হয়— মেজোমামার ডান হাতের মধ্যমার আধখানা উড়ে যায়। তবু মেজোমামা শখ ছাড়েন নি। নিজের হাতের তৈরি তুবড়ি উঠোনে রেখে লম্বা পাটশল্‌মীর ডগায় আগুন ধরিয়ে তুবড়ি জ্বালান— তুবড়ির ফুলঝুরিগুলি আমগাছ ছাপিয়ে উঠে উঠোনে ঝরে পড়ে। কিছুক্ষণের জন্য সোনার তারা-ফুলে ভরা সোনার গাছ উঠোন আলো করে তোলে।

এই উঠোনে প্রতি মাসে এক শনিবারে শনি পূজা, নারায়ণ-সেবা হয়। দুই পূজা একসঙ্গেই করার বিধি। এই পুজোয় আমাদের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি।

শনির দৃষ্টি— কালদৃষ্টি। শনিঠাকুরকে ঘরে ঢোকাতে নেই। শনিকে খুশি রাখতে পুজো তো দিতেই হয়, তবে ঐ বাইরে বাইরেই। এমন-কি প্রসাদটাও ঘরের ভিতরে নিতে নেই। তাই প্রচুর প্রসাদ পাওয়া যায় এদিন।

সন্ধেবেলা উঠোনে পুজো হয়। ছোটোরা কি বড়োরা কেউ বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ করে আসে পুজোয় আসবার জন্য। ছেলেবুড়োর ভিড় হয় এ পুজো ঘিরে।

পানের খিলির মতো কলাপাতা মুড়ে বড়ো-একটা ঠোঙা বানিয়ে আমরা ছোটোরা যে যার হাতে নিয়ে বসে থাকি।

শনির পূজা নারায়ণ-সেবায় 'সিন্নি' প্রসাদই আসল প্রসাদ। পুজো শেষে বড়ো একটা গামলায় চালের গুঁড়ো, নারকেল কোরা চিনি বাতাসা কলা আর দুধ— সব একসঙ্গে মেখে 'সিন্নি' হয়। আমরা কলাপাতার ঠোঙার সরু দিকটা মুখে নিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে ধরি— দিদিমা মামীরা তাতে সিন্নি ঢেলে দেন। ঠোঙার ফুটো দিয়ে গলে গলে সিন্নি মুখে পড়ে। বড়ো আরাম, হাত আর লাগাতে হয় না সিন্নি খেতে। গোলা সিন্নি হাত দিয়ে তুলে তুলে হাপুড়-হুপুড় করে খান বড়োরা।

ঠোঙার সিন্নি শেষ হয়ে গেলে আরো সিন্নি ঢেলে দেন দিদিমা। যত পারি খাই। পেট ভরে যায় সিন্নি খেয়ে।

শনির পূজার প্রসাদ নিঃশেষে সব শেষ হয়ে গেলে থালা গামলা ঘাটে ধুয়ে তবে ঘরে তোলেন বাসন মামীরা।

প্রসাদের কণাটুকুও না ঢোকে ঘরে, খুব হুঁশিয়ার!

ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে ঘুমের ঘোরে প্রত্যহ শুনি বড়োমামীমার কণ্ঠস্বর। বড়োমামীমা শ্রীকৃষ্ণের শতনাম বলেন।

তিনি বিছানা থেকে বলতে বলতেই ওঠেন—

'জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা-সাগর।'—

বড়োমামীমা মশারি খোলেন, বিছানা তোলেন— জোত-এ সব গুছিয়ে রাখেন, আর মুখে বলতে থাকেন—

'যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।'—

চলতে থাকে নামের তালিকা। কৃষ্ণের শত নাম শুনতে শুনতে ঘুম হাল্কা হয়ে আসে।

ঘরের মধ্যে বড়োমামীমার চলাফেরার শব্দে বুঝতে পারি বড়োমামীমা কি করছেন। বুঝতে পারি বড়োমামীমা এবারে মাদুর গোটাচ্ছেন; —বলছেন—

'দৈত্যারি দ্বারিকানাথ দারিদ্র্য ভঞ্জন
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ।'—

মাদুর গুটিয়ে কোনায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

'গজহস্তী নাম রাখে শ্রীমধুসূদন
অজামিল নাম রাখে দেবনারায়ণ';—

বড়োমামীমা এবারে দরজা খুললেন।—

'কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়োই মধুর
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড়ো চতুর।'

বড়োমামীমা বাইরে গেলেন। আর বলতে বলতে গেলেন—

'ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়
সে হরি বঞ্চিত হলে কি হবে উপায়।'

শতনাম শেষ হলে বড়োমামীমা সূর্যপ্রণাম করেন। তাঁর দিন শুরু হয়। এর আগে পর্যন্ত কারো সঙ্গে কথা বলেন না।

রাত্রে বড়োমামীমা 'শ্রীরাধার বারোমাসী' বলেন। রাধার বারো মাসের বিরহগাথা।

বিরহিণী রাধা প্রতি মাসে বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে কৃষ্ণের অভাব নিয়ে দুঃখ গাইছেন।

রাধার বারোমাসীটা শুনতে খুব ভালো লাগে। শুনি— আর একটা বেদনা বোধ করি রাধার জন্য।

অগ্রহায়ণ মাসে যখন নতুন ধানের ছড়া এনে দরজার মাথায় টানিয়ে দেয়— যখন নতুন চালের নবান্ন হয় কি পায়েস-পরমান্ন হয়—ভুরভুর করে নতুন চালের সুবাস; —প্রাণটা তখন মুচড়ে ওঠে। আহা— বারোমাসীতে আছে— রাধা দুঃখ করছেন— 'অঘ্রায়ণে নবান্ন হয় ঘরে ঘরে

আমার কুঞ্জে নাই যে কৃষ্ণ অন্ন দিব কারে?'

এই নতুন চাল ওঠবার পর থেকে আমাদের ভোরের জলখাবার হল— 'জাউভাত'। পুরো শীতকালটা জাউভাত খাই।

সকালবেলা এক মামী রান্নাঘরে ঢুকে বাসী কলসির জল ফেলে নতুন জল তুলে উনুন ধরিয়ে এক হাঁড়ি ভাত বসিয়ে দেন সব কাজের আগে।

ক্ষেতের চাল— সুগন্ধি চাল; চাল ফুটতে না ফুটতে সৌরভ ছড়ায়।

দিদিমা এগাছ ওগাছ থেকে বেগুনটা ঢেঁড়সটা, লতা-আলু থেকে ছিঁড়ে আলু কয়েকটা তুলে দেন ভাতে দিতে। সঙ্গে থাকে ঘরের গাওয়া ঘি। ছোটো বড়ো সকলে এই গলাভাত খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যে যার মতো কাজে হাত দেয়।

জাউভাতের সঙ্গে সদ্য জ্বাল দেওয়া ঘন খেজুর রস— অমৃত। সুরভিত রস, সুবাসিত চাল— দুই মিলিয়ে এক প্রাণমাতানো সম্ভার।

তুলসীমণ্ডপের ধারে এক সারি খেজুর গাছ, লম্বা— কোথায় উঠে গেছে গাছের মাথা।

শীত আসছে; শীত আসবার আগে মা'র 'গাছি-ভাই' এসে দাঁড়ায় খেজুর গাছ কাটতে।

কোমরে মোটা দড়ি জড়িয়ে কাস্তে কাটারি পিঠের দিকে গুঁজে গাছি-ভাই গাছ বেয়ে উঠে যায় উপরে। পুরোনো ডাল শুকনো ডাল কেটে সাফ করে। আমরা নীচ থেকে দুহাত তুলে লাফাই— 'ও গাছিমামা, ও গাছিমামা, একটা 'বাদি' কেটে দাও-না আমাকে'।

খেজুরের ছড়া নামবার আগে খেজুরের ফুল একসঙ্গে অনেকগুলি ছড়ার মোচার মতো গড়ন নিয়ে মাথা ফুঁড়ে বের হয়। নরম কচি এই 'বাদি' কাজে লাগে না আমাদের কোনো, তবু চাই। চাইতেই আনন্দ। হাতির দাঁতের রঙের বাদির গোছাটা হাতে নিই, গালে বুলোই, ঝেড়ে ঝেড়ে ফুলের রেণু বের করি, পাউডারের মতো রেণু ঝরে— ব্যস, বাদির কাজ শেষ হয়ে যায়।

অনেক বাদিই হয়— দু-একটা কাটলে খেজুরের কমতি হয় না কোনো।

গাছিমামা বাদি কেটে নীচে ফেলে দেয়, আমরা ছুটে হুমড়ি খেয়ে পড়ি— কে আগে নেব।

লম্বা লিকলিকে গাছিভাই, পরনে লেংটির মতো এক ফালি কাপড়। কাপড়ের চেয়ে বেশি দড়ি তার কোমর জড়ানো। এই কাজে দড়িরই যত প্রয়োজন। গাছের সঙ্গে কোমর একসঙ্গে ঘুরিয়ে বেঁধে গাছের গায়ে দু পা চেপে দড়িতে দেহের ভর ছেড়ে তবে দু হাতে দা ধরে খেজুর গাছের ডাল কাটে মাথা চাঁছে গাছিভাই। শক্ত কাঁটায় ভরা ডাল।

গাছিমামাকে দেখলেই পাড়ার ছোটোরা মিলে ছড়া কাটি।—

'ও গাছি, গাছ কাইটো না,
পরের মাইয়্যা বিয়া কইর‍্যা লেংটি পইরো না।'

গাছিমামা হাসে।

ছড়াটা শিখিয়ে দিয়েছিলেন সেজোমামা। সেজোমামা আর গাছিমামা এক বয়সী।

শীতকালে তাজা রস খাওয়ার একটা নেশা আমাদের। অন্ধকার থাকতে আসে গাছিমামা। আমরা তার আগেই উঠে বাইরে খেজুর গাছতলায় গিয়ে বসে থাকি, এক-একটা কাঁসার বাটি কোলে নিয়ে। শীত— শুকনো কাঠি পাতার আগুন জ্বেলে কাঁপতে কাঁপতে দু হাত বাড়িয়ে আগুনের তাপ নিই, আর গাছিমামার আশায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকি।

গাছিমামা এসে গাছে উঠে রসের হাঁড়ি পেড়ে আনে। এক-একটা হাঁড়ি নামায় আর আমাদের বাটিতে বাটিতে ঢেলে দেয়।

কুয়াশার ফাঁক দিয়ে লম্বা রেখায় রোদ এসে পড়ে। আমরা বাটি বাটি রস খাই।

যুদ্ধের শেষে চিনিমামা ফিরে এলেন 'বসরা' থেকে। যোগ দিয়েছিলেন অফিসের কাজে।

পরনে খাকি পোশাক। সারা গ্রামে বিস্ময় জাগলো মামাকে ঘিরে। অনেক প্যাকেট খেজুর এনেছেন মামা। দেশী খেজুর ছোটো ছোটো— এ খেজুর কত বড়ো!

প্রতি বছর উঠোনে জল ওঠে; জল উঠলে কষ্ট হরেক প্রকারের। চিনিমামা এবারে উঠোনে মাটি তোলালেন, উঠোন উঁচু করলেন। পুবের ঘরের পুবে যে

পুকুর, সেই পুকুরটাকেই আরো বড়ো আরো গভীর করে কাটালেন। এই পুকুর কাটা মাটিই উঠোনে ফেললেন— তুলসীমণ্ডপে ফেললেন; নিরামিষ ঘরের পিছনেও খানিকটা জমি উঁচু করলেন।

নতুন মাটি পায়ের চাপে চাপে সমান হয়ে বসতে কিছুদিন লাগল।

নতুন করে পুকুর কাটানো হল, খুব আনন্দ সবার। এবারে আর দূরে যেতে হবে না উন্‌নার দিনে খাবার জল আনতে। নতুন পুকুরের জল অতি ভালো।

পুকুরের জল তলা হতে উঠছে এখনো। ঘোলা জল।

দিদিমা বলেন— "ঘোলা বলে না, বল্ 'দুধ উঠছে পুকুরে'।"

উঠোন বাঁধানো হল, দক্ষিণের সীমানা বাঁধানো হল। নিরামিষ ঘরের পিছনে কলাবাগানেও মাটি ফেলা হয়েছে। এটাও একটা বেশ উঠোন মতো হল। এখানেও আর জল উঠবে না বর্ষায়।

দিদিমা কলাবাগানে নতুন মাটির ধারে ধারে লাউ-কুমড়োর বীজ পুঁতলেন, ঝিঙে ঢেঁড়স লাগালেন। দিদিমার হাতযশ খুব— তাঁর লাগানো বীজে ফলন হয় বেশি। পড়শিরাও কত সময়ে দিদিমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর হাত দিয়ে বীজ লাগান মাটিতে।

মাটি খোঁড়াখুঁড়ির বালাই নেই— দিদিমা মুঠোর মধ্যে বীজ নিয়ে ঘোরেন, যেখানে যেমন পছন্দ লাউ-কুমড়ো-শশার বীজটা একটু কাত করে মাটিতে পুঁতে দেন। তা হতেই অঙ্কুর বের হয়, লতা বেয়ে ওঠে। তার পর একদিন ফুলে ফলে ভরে ওঠে মাচা। শতাধিক লাউ ফলে দিদিমার হাতের লাগানো লাউলতায়।

কুটুম পাখি এসে উঠোনের বড়োই গাছের ডালে বসেই ডেকে ওঠে 'ইষ্টি কুটুম আয়— ইষ্টি কুটুম আয়'।

দিদিমা হাঁক দিয়ে মামীদের বলেন—'কুটুম পাখি ডাকলো গো, ভাতের চাল বেশি করেই নিয়ো। না-জানি কখন কোন্ কুটুম এসে পড়ে আজ'।

বাসন্তী রঙের পাখি, মাথাটা শুধু কালো তার। দিদিমার কাছে শুনেছি গল্প— এক গৃহস্থ-বাড়ির বউ— সারাদিন রান্নাবান্না করে সকলকে খাওয়ায়; সবার শেষে নিজে ভাত বেড়ে নিয়ে খেতে বসবে এমন সময়ে কুটুম আসে বাড়িতে। দজ্জাল শাশুড়িও তাড়াতাড়ি বউ-এর বাড়া ভাতটা এনে ধরে দেয় কুটুমকে খেতে। বউটা না খেয়ে থাকে। নিত্যি ঘটে এই ঘটনা। একদিন আর সইতে না পেরে বউ হলুদ জলের ন্যাকড়াটা গায়ে জড়িয়ে কালিমাখা ভাতের হাঁড়িটা উল্টে মাথায় দিয়ে পালাল বাড়ি থেকে। সেউ বউই পাখি হয়ে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি গিয়ে

এখন ডাক দিয়ে বেড়ায়— 'ইষ্টি কুটুম আয়— ইষ্টি কুটুম আয়'। গৃহস্থকে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়।

বাঁশঝাড়ে থাকে 'হাইরা-কোকা' একদল। ভারী ভারী পাখিগুলি— না কাক, না চিল, না ময়ূর। একটু একটু সব-কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে এ পাখি। কাকের মতো দেহের গড়ন, ময়ূরের মতো লম্বাটে পুচ্ছ, গাঙচিলের মতো বাদামী ডানা। এই পাখিগুলিকে উড়তে দেখি না কখনো। পায়ে পায়ে চলে বেড়ায়। তাড়া করলে ডানা দুটো মেলে গাছের ঝোপঝাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। —এই বার এদের ওড়া।

হাইরা-কোকারা একা একা ঘোরে। নির্জন দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে উঠোনে চলে আসে। চোখ দুটো সদাই সন্ত্রস্ত। দাঁড়কাকের মতো শক্ত কালো ঠোঁট। ডাকে যখন বাঁশঝাড়ে— ডাকটা লম্বা; শুরু করে— যেন জলে পড়বে-পড়বে ভয়— শেষে, পড়লো পড়লো পড়লো— পড়েই গেল। তারস্বর— ডাকের শেষটা। সাঁ সাঁ দুপুরে হঠাৎ শুনলে আঁতকে উঠি।

কত রকমের পাখি গাছে চালে ঝোপে জলে। ছোটো ছোটো 'দইয়াল' ফুরফুর করে ওড়ে। দলে দলে টিয়া বুলবুলি পাকা বড়োই খায়। ডালে ডালে কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠক্ কাঠ ঠোকে। 'বউ কথা কও' ডেকে ডেকে পাগল হয়। পুকুরে মাছরাঙা জলে-জাগা বাঁশের মাথায় বসে থেকে থেকে ছোঁ মেরে মাছ ঠোঁটে নিয়ে উড়ে যায়। সে যাওয়ায় রামধনু এঁকে দিয়ে যায়।

পানকৌড়ি সাঁতার কাটে জলে। পাড়ে দাঁড়িয়ে মুখ করে বলি— 'পানকৌড়ি, পানকৌড়ি, আমার লেইগ্যা একটা ডু-ব দে'। সাঁতার দিতে দিতে পানকৌড়ি টুপ্ করে জলের তলায় ডুবে যায়। খুশিতে নেচে উঠি— আমার কথা শুনছে পানকৌড়ি।

তপ্ত দুপুরে দাঁড়কাক এসে বসে উঠোনে কাপড় শুকোবার লোহার তারটায়। বসেই ঝুঁকে ঝুঁকে ডাক দেয়— 'কা— হা, কা— হা'—।

দিদিমা চঞ্চলপদে বেরিয়ে আসেন। তৃষিত কাকের ডাক— বড়ো অলক্ষুণে ডাক। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বলেন—

'কাকাসুরা ভালো দেইখ্যা ডাক্,
জল— জল গঙ্গাজল খা।
তিতা-বাড়ি থেইক্যা মিঠা-বাড়ি যা।'

শঙ্খচিল 'টি— টি' করে ওড়ে আকাশে।

উঠোনের উপর দিয়ে 'গুইসাপ' চলে যায় সরসর করে। অবিকল কুমিরের মতো দেখতে, তবে কুমিরের চেয়ে ছোটো। জলে থাকে, ডাঙায়ও ঘোরে। জলে মাছ খায়, ডাঙায় সাপ খেয়ে বেড়ায় ঝোপে জঙ্গলে।

'গুইসাপ' উঠোনে উঠে গোল গোল চোখ পাকিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখে নেয় চার দিকটা, দেখেই গা বেঁকিয়ে লেজ আছড়ে বেঁটে বেঁটে পায়ে দৌড়ে পালায়। লম্বা জিব, সাপের মতো চেরা; লক্ লক্ করে জিবটা মুখে।

কোনোদিন হয়তো জঙ্গলে বনে আম খেজুর, কি আর-কিছু কুড়োতে গেছি— শুনি খস্‌খস্ আওয়াজ, তার পরেই দেখি একটা গুইসাপ মাথা তুলে দেখছে আমাকে। অমনি ছুটে পালিয়ে এসেছি তার ত্রিসীমানা থেকে। দিদিমা বলে দিয়েছেন— 'গুইসাপ যদি লেজের বাড়ি মারে, সেই ঘা শুকোয় না কখনো।'

গুইসাপের লেজ কুমিরের মতোই মোটা আর লম্বা।

'বাঘডাসা' ডাকে 'মাত্— মাত্' করে বর্ষাকালে, বুক কাঁপানো ডাক।

'সেজা' আসে রাত্রিবেলা। উঠোনের উপর দিয়ে চলে— শব্দ ওঠে 'ঝুমুর ঝুমুর'। সকালে উঠে দেখি সজারুর কাঁটা পড়ে আছে উঠোনের এখানে ওখানে। তুলে নিই, কাপড়ে ফুলতোলার কাজে লাগে এই কাঁটা। সজারু আসে মানকচু খেতে। কচুর ডগা পাতা ঠিক ঠিক তেমনটিই থাকে মাটির উপরে— কচুটা খেয়ে যায় মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে।

'খাটাস' বের হয় মাঝে মাঝে। খাটাসের গায়ের গন্ধ টের পাওয়া যায় দূর হতে। যেখান দিয়ে যায়, গায়ের গন্ধ রেখে দিয়ে যায়। রাত্রিবেলা যদি কখনো এসেছে বাড়ির কাছাকাছি— সকালবেলা মামীরা নাকে গন্ধ টেনে বলেন— 'হুঁ হুঁ—ঠিক; কাল রাত্রে খাটাস এসেছিল এ দিকে'।

একদিন মেজমামী কি কাজে উত্তর দিকে ঝোপের কাছে গেছেন, দেখেন জলের ঐ ধারে গাছে খাটাস বসে আছে একটা।

বর্ষার জল নেমে গিয়েও তখনো থেমে আছে মাঠে বিলে। খাটাসের গাছটা ছিল অর্ধেকটা জলের নীচে। চিনিমামা খবর শুনে তখুনি বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে নৌকো করে বের হলেন খাটাস মারতে।

একটু পরে দুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। চিনিমামা বন্দুক ছুঁড়েছেন। আমরা উঠোনে অপেক্ষা করছি— খাটাস নিয়ে আসবেন মামা।

মামা এলেন। পরনের খাকি প্যান্ট শার্ট জলে জবজবে।

গলুইতে দাঁড়িয়ে মামা বন্দুক ছুঁড়েছেন, বন্দুকের ধাক্কায় নিজেই জলে পড়ে গেছেন।

—আর খাটাসটা?

চিনিমামা কম কথা বলেন। এ কথার জবাব না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন।

কত জন্তু কত পাখি কত সাপ পুকুরের ধারে ধারে।

পুকুরের পাড় ঘিরে বেতের ঝোপ, বোন্না হিজল গাছ। সরু লম্বা বেতের শিষগুলি হাওয়ায় দুলে নিজেরা নিজেদের আঁকড়ে ধরে ঝোপ করে। ঘন ঝোপ।

জলের উপরে ঝুঁকে পড়া হিজলগাছের ডালে ঝোলে 'শিবের জটা'র মতো হিজল ফুলের গুচ্ছ। টুকটুকে লাল— অতি মিহি ফুল। এক-একটা জটায় এমন হাজারো ফুল থাকে।

এই ফুলগুলি অহোরাত্র ঝরে ঝরে পড়ে জলে। আলগোছে পড়ে— আলগোছে ভেসে থাকে; যেন আবির ছড়ানো ওড়নাখানি বিছিয়ে রেখেছে কেউ জলের উপরে।

মামীরা ঘাটে স্নান করতে আসেন, ঘাটের জলে গোল হয়ে আবর্ত ওঠে, সেই গোল বড়ো হতে হতে চলে যায় পুকুরের ঐ পারে, লাল ওড়নাটা কেঁপে ওঠে থরথর করে।

কোনো কোনো মাসে মৌনীস্নানের যোগ পড়ে। দিদিমা বলেন, 'মুনিস্নান'। কাক কোকিল না ডাকতে স্নান করতে হয় মৌন অবস্থায়। স্নানের আগে মুখ খোলা নিষেধ।

আগের দিন রাত্রে খাটের বাজুতে কাপড় গামছা ঠিক করে রেখে দেন মা। শেষরাত্রে আমাদের ঠেলে ঠেলে তুলে দেন, ইশারায় সঙ্গে যেতে বলেন।

মা'র গায়ের বর্ণ গৌর। আমার অতি ছোটোবেলায় বাবা মারা গেছেন। মা'র সধবা-রূপ মনে নেই আমার। চোখে আছে শুধু মার দেহের এক টুকরো স্থান— মা'র খোলা ডান কাঁধটুকু। আর, সেই কাঁধের কাছের কাঁচা সোনার 'বিস্কুট'-প্যাটার্নের মোটা হারের খানিকটা। মা'র রঙে সেই সোনার হার মিলে-মিশে থাকত— স্পষ্ট ধরা আছে চোখে। সেই রঙ শোকে তাপে রোদে জলে স্লান হয়ে গেছে। তবু, এই মৌনীস্নানের দিন মা যখন পুকুরঘাটে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়ান উঠোনে— সূর্যের প্রথম [illegible] এসে পড়ে গায়ে, শিশুকালের দেখা মা'র কাঁধের সেই রূপটি চোখে ভেসে ওঠে আমার।

আমের দিনে আম খেয়ে চার দিকে ছুঁড়ে ফেলা আমের আঁঠি থেকে কচি দুটি পাতা নিয়ে আম চারা সবে বের হয়— এই আঁঠির খোলাটা ফেলে শাঁসটা ঘষে ঘষে একদিকের খানিকটা ক্ষইয়ে নিয়ে ফুঁ দিই। আম আঁঠির ভেঁপু বেজে ওঠে।

সারাদিন একের পর এক এই বাঁশি বানাই, আর ফুঁ দিয়ে দিয়ে বাজিয়ে বেড়াই।

আমাদের বাড়িতে আমরা বাজাই, চুনি নীরু ওদিকে বাজায়, পরাইন্যা বাজায় দক্ষিণ দিক ঝালাপালা করে। সুনীতি নলিনী পাগলা বলাই ওরাও আসে আম আঁঠিতে ফুঁ দিতে দিতে। দিনের মধ্যে কতবার এ বাড়ি ও বাড়ি করি বাঁশি বাজিয়ে।

সন্ধেবেলা সব ফেলে দিয়ে ঘাট থেকে হাত-পায়ের ময়লা ধুয়ে বাড়ি আসি।

মামীরা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বেলে হাতের আড়াল দিয়ে হাওয়া বাঁচিয়ে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখান।

দিদিমা সব সময়েই বলেন— কাউকে খারাপ কথা বলতে হয় না। বিধাতাপুরুষ যিনি— তিনি উপরে আকাশে বসে থেকে থেকেই বলে চলেছেন— 'তথাস্তু, তথাস্তু'। কোন্ কুবাক্যটা সেই 'তথাস্তু' কথার মধ্যে পড়ে যায়— কে বলতে পারে?

উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি— বিধাতাপুরুষ কোথায় বসে?

মাথার উপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায়— পাকা ফল কোন্ গাছে আছে সেই উদ্দেশে। বাদুড় জাগলে আর বাইরে থাকতে নেই।

দিদিমা ডাক দেন— 'আয়, ঘরে আয় সব'।

গভীর রাত্রে অর্জুনগাছের ডাল হতে প্রহরে প্রহরে 'কোরাল' ডেকে ওঠে,— 'অ-হ-হ-হ— অ-হ-হ-হ'। যেন কার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস।

মাঝে মাঝে 'খিক্‌খিক্—খিক্, খিক্‌খিক্—খিক্'— হেসে ওঠে কে।

দিদিমা বলেন, ভুতুমপেঁচা।

নন্দীবাড়ির ঘাট্‌লায় রোজ বিকেলে জড়ো হয় পাড়ার মুরুব্বিরা। পুণ্য ঘোষ আসেন, দীননাথ কবিরাজ আসেন, হেরম্ব দে আসেন, যতীন সরকার আসেন— নন্দীবাড়ির জামাই আসেন— পাড়ার যত গিন্নিরা আসেন। ওপাড়া হতেও আসেন অনেকে। কারো বাড়িতে এল কেউ— তাঁরাও আসেন। ঘাট্‌লাটা যেন গ্রামের বৈঠকখানা।

'সুন্দরী' মরে গেছে, অতসীর ভালো বিয়ে হয়েছে। রূপের ডাকেই বড়ো ঘরে পড়েছে অতসী। সুনীতির বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। মলিনা শ্বশুরবাড়িতে। চৌধুরীবাড়ির ছেলে বিয়ে করে বউ এনেছে। রায়বাড়ির মেজছেলেরও বিয়ে শিগ্‌গিরই। মেয়ে যায়, মেয়ে আসে— গ্রামের মেয়ে কমে না।

খবর এসেছে বড়দা দেশে ফিরবেন এইবার। বারো বছর বিলেতে আছেন তিনি।

শীত শেষ হয়ে এসেছে। ঘূর্ণি হাওয়া শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাঁশবনের পাতায় শন্‌শন্ শব্দ উঠছে।

একদিন ঘাট্‌লার ভিড়টা চলে এল মা'র বাপের বাড়ির উঠোনে।

পর পর তিনটি ডুলি— মা, দিদি, আমি উঠলাম ডুলিতে।

চললাম কলকাতা।